এপ্রিল ২০২৪ ■ চৈত্র ১৪৩০-বৈশাখ ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম সরকার

রমজান ও ঈদুল ফিতরের মাহাত্ম্য

এসো হে বৈশাখ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২৪ ❑ চৈত্র ১৪৩০-বৈশাখ ১৪৩১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই এপ্রিল ২০২৪ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

সম্পাদকীয়

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগারে অন্তরিন থাকায় তাঁর পথনকশা অনুসরণ করে তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সহচরদের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং এ সরকারের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুজিবনগর দিবসটি নানান দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ উপলক্ষে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

প্রতিটি মুসলমানের কাছে রমজান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসের ফজিলত অনেক বেশি, কারণ এটি রহমত, মাগফেরাত আর নাজাতের মাস। রমজানে রোজা আদায় করার মাধ্যমে আমরা সংযমের শিক্ষা লাভ করি। এক মাস রোজা রাখার পর আসে অন্যতম বড়ো ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। ঈদ এসেছে, সঙ্গে এনেছে শান্তি আর আনন্দের সওগাত। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

বাঙালির অবিচ্ছেদ্য উৎসব বাংলা নববর্ষ। পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ বর্ণিলভাবে ধরা দেয়, চারদিকে থাকে উৎসবের ছোঁয়া। নানান জায়গায় হরেক রকম খাবার ও খেলনার পসরা নিয়ে বসে বৈশাখি মেলা। পহেলা বৈশাখ যেন প্রাণের উৎসব। জেগে ওঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস। নতুন আগামীর সম্ভাবনায় নতুন বছরকে বরণ করে নেয় বাঙালি। এ সংখ্যায় এ বিষয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

২০১২ সালে ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ দিবসকে নিয়ে থাকে নানা আয়োজন। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া *সচিত্র বাংলাদেশ* এপ্রিল সংখ্যায় আরও আছে বিভিন্ন বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, অনূদিত গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম সরকার ৪
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

মুজিবনগর সরকার গঠন ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ৬
ড. মো. এমরান জাহান

এসো হে বৈশাখ ১১
ড. সরকার আবদুল মান্নান

উৎসবের আর্থসামাজিক স্বার্থ ১৪
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

রমজান ও ঈদুল ফিতরের মাহাত্ম্য ১৭
খালেদা বেগম

তামাক ও মাদকাসক্তি পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ২০
অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২৩
অনুপম হায়াৎ

বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের বহুমাত্রিকতায় বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচন ২৫
মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

পরিবর্তনশীল আগামীর দক্ষতায় বই ৩০
আফরোজা নাইচ রিমা

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৩২
কে সি বি তপু

অটিজম বিষয়ে সচেতন হোন ৩৬
ইসমত আরা পারভীন

শব্দদূষণ রোধে সচেতনতার বিকল্প নেই ৩৮
জুয়েল মোমিন

গল্প

দুর্ঘটনা ৪০
হেলাল উদ্দিন আহমেদ

সাহস ৪৪
কামাল হোসাইন

কবিতাগুচ্ছ ৪৭-৫০
রুস্তম আলী, শাহীন খান, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, আলমগীর কবির, সামসুন্নাহার ফারুক, মিজানুর রহমান মিথুন, মোল্লা আলিম, রীনা তালুকদার, আনসার আনন্দ, আবদুল মজিদ, আতিক আজিজ, আতিক রহমান, খান চমন-ই-এলাহি, তারিকুল আমিন, মাশ্‌হুদা মাধবী, ইকবাল কবীর রনজু

বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৫১
প্রধানমন্ত্রী ৫২
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৩
উন্নয়ন ৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৬
শিক্ষা ৫৬
নারী ৫৭
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৮
অর্থনীতি ৫৯
কৃষি ৫৯
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১
সামাজিক নিরাপত্তা ৬২
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
না ফেরার দেশে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী খালিদ ৬৪

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম সরকার

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস, একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে কুষ্টিয়া জেলার তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থানটির নামকরণ হয় 'মুজিবনগর' এবং সেখানে শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে যখন মুজিবনগর অধ্যায়টি সংগঠিত হয়েছিল, তখন তিনি পাকিস্তানি কারাগারে। তাঁর নির্দেশনা ও ছক অনুসারেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ বিজয়ী আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক চক্র। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতি দিক নির্দেশনা পায়। এ ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীদের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। মূলত ১০ই এপ্রিল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন ও বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ও নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে এ সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়। ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা ও মুজিবনগর সরকার নিয়ে 'মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম সরকার', 'মুজিবনগর সরকার গঠন ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া' ও 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. ৪, ৬ ও ৩২

মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম সরকার

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

আপাতদৃষ্টিতে মুজিবনগর সরকার প্রবাসী সরকার হলেও বাস্তবে তা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। নানা বিচারে এই সরকারের বেশকিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, এই সরকার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল। উল্লেখ্য, তখন এই অঞ্চল ছিল স্বাধীন এবং এর নতুন নাম হয় মুজিবনগর। আরও উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই যে– এ ধরনের সরকার দেশের স্বাধীন ভূমিতে শপথ গ্রহণ করেছে। প্রবাসী সরকার সবসময় বন্ধুভাবাপন্ন সহযোগী দেশের মাটিতে গঠিত হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে মুজিবনগরই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। অবশ্য নিরাপত্তার কারণে রাজধানীর সদর দপ্তর ছিল কলকাতায়। দ্বিতীয়ত, এই সরকার ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই সরকার ছিল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধ। তৃতীয়ত, এই সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম মুক্তিযুদ্ধ। 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটির শুরুতে আমরা যে 'দীর্ঘ' বিশেষণটি ব্যবহার করি, তা আবেগাশ্রিত, তাতে ইতিহাস নেই। ইতিহাস হলো, আমাদের ১৯৭১-এর যুদ্ধটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলা বা মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১০ই এপ্রিল এই সরকার স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করে এবং উল্লেখ করে যে, স্বাধীনতার ঘোষণা ইতঃপূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করেছেন। সেদিনই বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হবে এবং হয়েছিলও তাই। অর্থাৎ তাজউদ্দীন আহমদের দূরদর্শিতা ছিল। নেতাদের মধ্যে এমন দূরদর্শিতা কাম্য। তাঁর-ই বিচক্ষণ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা ছিল এই সরকারের কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রপতি; তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য সদস্য ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান। সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল বারোটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। সরকারের কর্মকাণ্ডে তিন ধরনের বিভাজন ছিল: বেসামরিক প্রশাসন, সামরিক বিষয়াবলি (প্রধান বিষয়) এবং স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা। প্রধানত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা এই সরকারের প্রধান কাজ হলেও যুদ্ধ-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও এই সরকার সচেতন ছিল এবং তার প্রমাণ ছিল পরিকল্পনা সেল গঠন। সেলটির প্রধান ছিলেন যশস্বী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী। অন্যান্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন, ড. এস আর বোস এবং ড. আনিসুজ্জামান।

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের গণহত্যার অভিযান শুরু হলে সামরিক-বেসামরিক বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। সূচনা

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স

পর্বে বোধগম্য কারণে এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন ও সমন্বয়হীন এবং যার ফলে বিপর্যয়ও হয়েছিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই মুজিবনগর সরকারের দিক নির্দেশনা ও উদ্যোগে সারা বাংলাদেশকে যুদ্ধের এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক সেক্টর একজন অধিনায়কের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য দশ নম্বর সেক্টর নৌ-সেক্টর হবার কারণে যুদ্ধের মানচিত্রে দৃশ্যমান ছিল না। উপরন্তু ছিল বিশেষ বাহিনী। যেমন জিয়াউর রহমানের অধীন ছিল জেড ফোর্স, খালেদ মোশাররফের অধীন ছিল কে ফোর্স এবং এস ফোর্স ছিল কে. এম. শফিউল্লাহর অধীন।

বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কূটনৈতিক তৎপরতার সূচনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের 'To The People of the World' শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে। বিবৃতির সমাপ্তি বক্তব্য ছিল:

> In our struggle for survival we seek the friendship of all people, the big power and the small… We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood. Everyday this is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of humanity act now and earn our undying friendship.

এটা জানা কথা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের জনমত ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। এমনকি মার্কিন সরকার বিরোধিতা করলেও অসংখ্য মার্কিন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বিজয় অর্জনের অনেক আগেই বিশ্ব জনমতের রায়ে আমাদের নৈতিক বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল এবং যার সবটুকু কৃতিত্ব তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন বঙ্গবন্ধুর নামে গঠিত ও পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের। উপরন্তু এই সরকারের সাফল্যের কারণেই ১৬ই ডিসেম্বরের আগেই ভুটান ও ভারত বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও তার একটি চিঠি নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল (৪ঠা ডিসেম্বর), যার শেষাংশে বলা হয়েছিল: 'There can be no proper evaluation of the present situation, its causes, present state and future solutions, without Bangladesh being given a hearing.' আর এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের তীর্যক মন্তব্যটি ছিল: 'Without hearing the voice of Bangladesh is like playing Hamlet without the prince of Denmark.'

ফিরে দেখে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মুজিবনগর সরকার–বাংলাদেশের প্রথম সরকার ছিল একটি সফল সরকার। সাফল্য ছিল মাত্র ন'মাসে বিজয় অর্জন করা। সাফল্য ছিল বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে টেনে আনা । সাফল্য ছিল সামরিক বিজয়ের আগেই কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক হিসেবে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি অর্জন করা।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

মুজিবনগর সরকার গঠন ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া

ড. মো. এমরান জাহান

ক

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে আনুষ্ঠানিক বিপৎসংকুল যাত্রা শুরু হয়, এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া কী ছিল– এ বিষয়টি অনুসন্ধান করাই আলোচ্য নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এই জরুরি বিষয়টি বেশ সহায়ক হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে প্রথম স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামেই অধিক পরিচিত। এই আলোচনার শুরুতেই মুজিবনগর সরকারের উদ্ভব ও প্রকৃতি নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলা দরকার।

মুজিবনগর সরকারই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। এই সরকার যেহেতু বিদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করেছে তাই কেউ কেউ একে প্রবাসী সরকার বলেও অভিহিত করে। তবে সাধারণের মধ্যে মুজিবনগর সরকার অধিক জনপ্রিয়। এই সরকারের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ও বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজ্ঞাতপ্রসূত কিছু বিভ্রান্তিও আছে।

সাধারণে এই ধারণা প্রচলিত আছে, বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার গঠন করেন তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। আবার এরূপ একটি ধারণাও আছে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই বিভ্রান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আমি লক্ষ করেছি। ১৬ই ডিসেম্বর না করে আমরা কেন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করছি– এমন প্রশ্নও শুনতে হয়েছে।

একই ভাবে মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়েছিল– এ নিয়েও সংশয় কাটেনি অনেক শিক্ষিতজনের মধ্যে। ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিলকে মুজিবনগর সরকার গঠনের তারিখ বলে মনে করে থাকেন। এটাই ইতিহাসে সত্য যে, ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও বৈধ রাষ্ট্রসত্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিণতি লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণীর প্রথম লাইনটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা ঘোষণা করা হয় (... from today Bangladesh is independent)। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫-২৬শে মার্চ ভয়ানক রাত। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী যখন অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা মোতাবেক গণহত্যা শুরু করে এরই প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা বাণীর শেষ বক্তব্য ছিল– and final victory is achieved। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পরক্ষণেই তিনি ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন।

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় আস্থা ছিল যে বাঙালি জনতাকে তিনি যে মুক্তির মন্ত্রণা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন, সে জনতা বিজয় লাভ করবেই। নয় মাস পর ৩০ লাখ মুক্তিকামী মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হয়। মুজিবনগর সরকার কোথা থেকে পরিচালিত হচ্ছে– এই নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কৌতূহলের কমতি ছিল না। বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকেই পরিচালিত হচ্ছে বলে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল। আর এই সরকারের রাজধানী মুজিবনগর। মুজিবনগর সরকারের দায়িত্বশীল কেউই স্বীকার করেনি যে এই সরকার ভারতের কলকাতা থেকে পরিচালিত হচ্ছে। পাকিস্তান সামরিক সরকার বিশ্ব দরবারে বার বার ভারত সরকারকে এই বলে দোষারোপ করে আসছিল যে, ভারত সরকারের মদদে ভারতের ভূখণ্ডে থেকেই মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ভারত সরকার কখনো স্বীকার করেনি যে ভারতেই এই সরকারের সদর দপ্তর রয়েছে। এমনকি কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে ছিল সকল বিদেশি মিডিয়ার কর্মীর কেন্দ্রস্থল। অদ্ভুত ব্যাপার তারাও প্রচার করেনি যে মুজিবনগর সরকার কলকাতায় অবস্থান করছে। সেখানকার কাগজপত্রে বলা হতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন, ৯ সার্কাস এ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৭। (Mission of the People's Republic of Bangladesh, 9-Circus Avenue, Calcutta-17).

এই কার্যালয়টি পূর্বে পাকিস্তানি কনসুলেটের কার্যালয় ছিল। উল্লেখ্য, মুজিবনগর সরকারের প্রথম মিশন খোলা হয় কলকাতায়। আর দ্বিতীয় বাংলাদেশ মিশন ছিল যুক্তরাজ্যে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য মিশন খোলা হয়েছিল। এই মিশন প্রবাসে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড প্রচার এবং বহির্বিশ্বে

MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

9-CIRCUS AVENUE,
CALCUTTA-17

No.B-5/4/71.

May 15, 1971.

To

Dr. M.M. Haq,
President,
Bangladesh Association,
Scotland,
15, Eldon Street,
Glasgow, C.3. (United Kingdom).

Dear Sir,

Kindly refer to your letter dated nil addressed to Mr. M. Hossain Ali, Head of Mission of the People's Republic of Bangladesh, Calcutta.

2. The Head of the Mission conveys his thanks to the members of Bangladesh Association, Scotland for the support to the cause of Bangladesh. The people of Bangladesh are engaged in a fierce battle with the invading Pakistani troops and require substantial help to liberate Bangladesh. We would, therefore, request you to mobilise all available resources to achieve our common goal.

3. You will be happy to learn that we have been able to open a bank account in London in the following name:

Bangladesh Fund A/C No.007-266-30
Hambros Bank, 41,Bishop's Gate,
London E.C.3.

The names of the Trustees for the account are Hon'ble John Stonehouse, MP, Mr. Donald Chesworth and Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, Vice-Chancellor of the University of Dacca. Kindly deposit all contributions collected for Bangladesh, in this account under intimation to the Trustees. Funds from this account will be drawn by the Government of Bangladesh from time to time for utilisation in the cause of Bangladesh, particularly to help and equip the liberation forces.

4. Mr. Mohammad A. Samad, elected member of the National Assembly and leader of Bangladesh delegation to the World Peace Conference at Budapest will visit London shortly on a mission from the Government of Bangladesh. You are advised to please keep in touch with Mr. Justice A.S. Chowdhury at present in London, about Mr. Samad's arrival and programme. Mr. Chowdhury's office address is 11,Goring Street, London, EC 2. Telephone:283-36232, 283-38526.

5. Mr. Chowdhury has been appointed by the Acting President of Bangladesh as the country's Representative at the United Nations Organisation. He has also been authorised to coordinate the organisations formed in different parts of the U.K. and the continent to raise funds and to mobilise support in favour of Bangladesh. We hope you will extend him all help and co-operation which will further the cause of Bangladesh.

Given due help, victory would be ours Insha Allah.

Joi Bangla.

কলকাতার মিশনের একটি অফিসিয়ালপত্র, ১৫ই মে ১৯৭১

জনমত প্রচারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে প্রায় ৯ মাস মুজিবনগর সরকার দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত এই প্রবাসী সরকার স্থায়ী ছিল। এই সময়টি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দীন আহমদ। দুইজনই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর। আরও ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান। আর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর ওপর। তাঁরা সবাই ছিলেন ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আইন সভার নির্বাচিত প্রতিনিধি।

প্রশ্ন হলো এই সরকারের বৈধতা কি ছিল?

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকারের বহির্বিশ্বে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুটি বৈধ ও নৈতিক ভিত্তি ছিল। প্রথমত, ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, যা বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' (Proclamation of Independence)। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে এই ঘোষণাপত্রটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা সর্বসম্মতিভাবে সমর্থিত ও গৃহীত হয়েছিল। ২৬শে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণাকে আইনগত বৈধতা ও স্বীকৃতি দিয়েছিল ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আর এই 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি আরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে এই কারণে যে, এই ঘোষণাপত্রটির ওপর ভিত্তি করেই দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়।'

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এর আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়া বাধ্যবাধকতা হয়ে পড়ে। আর সেই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের ভেতরে কোনো এক নিরাপদ স্থানে আয়োজন করার কৌশলগত প্রয়োজন পড়ে। স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার ৭ দিন পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল সে সময়ের কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে এই প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকারের রাজধানী কার্যালয় ঘোষণা করা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর। এই স্থানটি ভারতীয় সীমান্তের ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার আনুষ্ঠানিক নামকরণ ঘোষণা করেন মুজিবনগর। সে থেকে প্রবাসী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' বলে পরিচিত হয়। যদিও এই সরকারের মূল কার্যালয় ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। আর লিয়াজোঁ অফিস ছিল ৯নং সার্কাস এ্যাভিনিউ। তাই এই সরকার প্রবাসী সরকার বলেও অভিহিত। ভারতের সীমান্তবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখণ্ড মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রবেশ করে অতি অল্প সময়ে শপথ গ্রহণ করে এই সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি বিধিবদ্ধ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী সদস্য এই সরকারের মূলভিত্তি। মুক্তিযুদ্ধ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্যে গোটা অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন বাঙালি সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বাঙালি অফিসার সবাই ছিলেন পাকিস্তান আর্মির সদস্য। মাতৃভূমির এই ক্রান্তিলগ্নে তাদের বড়ো একটি অংশ বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে।

খ

মুজিবনগর সরকার গঠন নিয়ে গণমাধ্যম

এখন আমাদের দেখার বিষয়, এই প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে বহির্বিশ্বের রাজনীতি ও মিডিয়ায় কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান আর্মি থেকে বিদ্রোহ করে বাঙালি অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার খবর গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বিদেশি সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে। বিশেষ করে মার্কিন গণমাধ্যম সংবাদের বড়ো প্রতিবেদন তৈরি করে। সংবাদ ভাষ্যে জানা যায়, এই দুটি ঘটনা সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী মানুষদের প্রচণ্ড উজ্জীবিত করে এবং তাদের আশাবাদী করে তোলে। ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ জোরদার হয় এবং পাকিস্তান আর্মির পূর্ব পাকিস্তানের হেডকোয়ার্টার খোদ ঢাকায় শক্তিশালী গেরিলা আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বিপরীত দিকে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে প্রবলভাবে। একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মার্চ থেকে চলমান হত্যাকাণ্ড বিপরীতে প্রতিরোধ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সংবাদ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজ পায়। গবেষক হাসান জহিরের গ্রন্থে (পৃ. ১৭৯) উল্লেখ আছে, ১৭ই এপ্রিল তারিখে ঐ শপথ অনুষ্ঠানে প্রায় দুই ডজন বিদেশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদকর্মী উপস্থিত ছিল (*The Seperation of East Pakistan, The Rise and Realization of Bengal Muslim Nationalism*)। বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কলকাতায় অবস্থানরত বিদেশি সংবাদকর্মীদের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

তার আগেই ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা এবং মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ বিদেশি মিডিয়ার হাতে চলে যায়। তবে তা সীমিত পরিসরে বলে মনে হয়। বহুল প্রচারিত মার্কিন সাময়িকী *নিউইয়র্ক টাইমস* ১৪ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করে। দিল্লি থেকে সিডনি এইচ. শ্যানবার্গের তৈরি করা এই প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়া হয়, 'BENGALS FORM A CABINET AS THE BLOODSHED GOES ON'. ব্যাপক রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞের মধ্যে দিয়েই বাঙালিদের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার পূর্বে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনের একটি পটভূমি তৈরি করে। পটভূমিকায় *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকাটি লিখে, আমাদের সংবাদদাতা সিডনি এইচ. শ্যানবার্গ এখন দিল্লিতে অবস্থান করছেন। তিনি গত চারদিন ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সফর করেছেন এবং কিছু সময় পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছেন। সেই নিরিখেই সরেজমিনে তৈরি এই প্রতিবেদন।

বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে দেশি-বিদেশি সংবাদকর্মীবেষ্টিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

উল্লেখ্য, ২৫শে মার্চ যে ৩৫ জন বিদেশি সংবাদকর্মীকে আটক করা হয় এবং পরদিন ঢাকা থেকে বিতাড়িত করা হয় তাদের মধ্যে এই সিডনি শ্যানবার্গও ছিলেন। মার্কিন সংবাদদাতা শ্যানবার্গ প্রতিবেদনটি শুরু করেন এভাবে, 'আগরতলা, ভারত, ১৩ই এপ্রিল– প্রকাশিত খবর অনুযায়ী যদিও গত অভিযানে স্বাধীনতাকামী বাঙালি নেতা অনেকেই নিহত হয়েছেন এবং সেখানে একটি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলেছে, এর মধ্যেই তাঁদের ঊর্ধ্বতন কিছু নেতা, যাঁরা এখনো জীবিত রয়েছেন তাঁরা একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।' খবরে আরও বলা হয় যে, শ্যানবার্গ এই মন্ত্রিসভার প্রধান তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি তাঁদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন'। সংবাদদাতা সিডনি আরও লিখেন, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে যদিও বলা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবচিত্র দেখে মনে হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। (While the central Government, which is dominated by West Pakistan continues to announce that the situations calm in the East and conditions are returning normal, a far different picture emerges on the scene.)

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের খবর হানাদার পাকিস্তানি সামরিক সরকারের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না মোটেই। বহির্বিশ্বে প্রচারের ফলে পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক মহলের চাপের মধ্যে পড়েছিল। পত্রপত্রিকার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর গোয়েন্দাপ্রধান ছিলেন পাঞ্জাবি জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খান। ২৪শে মে তারিখে মার্কিন সাময়িকী *টাইম* ম্যাগাজিনের এক রিপোর্টে জানা যায়, করাচিতে প্রায় অর্ধ ডজন বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে জেনারেল আকবর বলেন, 'আমরা অপবাদ ও পক্ষপাতিত্বের শিকার হচ্ছি।' (We have been maligned.) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পাকিস্তান সরকার বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার বলে দাবি করে। (Concocted items put out by foreign press and radio)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন এবং ঘটনাদি বিশ্বমিডিয়ায় কভারেজ পাওয়া পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে খুবই বিব্রত করে এবং তাদের অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাদের পরিকল্পনা ও ধারণা ছিল বিদেশি সাংবাদিককে অন্ধকারে রেখে এবং দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সরশিপ ও মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে গণহত্যা বিষয়টি বিশ্ববাসীর কাছে গোপন করে যাবে। আমরা জানি, ২৬শে মার্চ রাতে ঢাকায় দায়িত্ব পালনরত সকল বিদেশি সংবাদকর্মীকে (৩৫ জন) পাকিস্তান সামরিক সরকার ঢাকা থেকে একবস্ত্রে বিতাড়িত করেছিল। এই ভয়ানক অবস্থা থেকেও সাইমন ড্রিং এবং মিচেল লরেন্ট এই দুই সংবাদকর্মী নিজেদেরকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আড়াল করতে পেরেছিলেন। মুজিবনগর সরকার গঠনের দিন সরকার কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে কিছু বিদেশি সংবাদকর্মীকে তাৎক্ষণিক নোটিশে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানায়। কারণ বিষয়টি ছিল খুবই গোপন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী নিরাপত্তা বিধান করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মার্কিন দুটি পত্রিকার সংবাদকর্মী তাদের পত্রিকা *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এবং *টাইম* ম্যাগাজিনে সংবাদ প্রেরণ করে। এই সংক্রান্ত সংবাদ যথাক্রমে ২১শে এবং ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রতিবেদন

আকারে প্রকাশ করে। মার্কিন পত্রিকা *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের* স্টাফ রিপোর্টার পিটার কান মেহেরপুর ভ্রমণ করে এই প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। দীর্ঘ প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল–

A FLICKERING CAUSE
East Pakistanis Pledge To Fight To the Death
But Mostly They Don't
They Lack Arms, Leadership To Prolong Their Revolt:
No Aid by Other Nations
Too Many Patrick Henrys ?

পিটার আর. কানের এই প্রতিবেদনে ১৭ই এপ্রিলের মুজিবনগর সরকারের দৃপ্ত শপথ প্রসঙ্গ আলোচনা করে প্রচার করে যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধরত বাঙালি তাদের স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু অবধি যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সামনে অনেক বিপদ মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে বিস্তীর্ণ গ্রামে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলন ও গেরিলা যুদ্ধ বর্ষাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্যে ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে। আর পাকিস্তানের সীমিত সম্পদ দ্বারা এই দীর্ঘ যুদ্ধের ব্যয় কীভাবে নির্বাহ করবে– তাও বিরাট একটি ভাবনার বিষয়। কীভাবে সে প্রতিবেশী ভারতকে মোকাবিলা করবে, যদি ভারত রাষ্ট্র নতুন প্রবাসী সরকার ও বিদ্রোহী বাঙালির সংগ্রামে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন জানায়।' পত্রিকাটি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, পাকিস্তান যদি দীর্ঘদিন এই যুদ্ধের মোকাবিলা করে তবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এতে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের স্টাফ রিপোর্টার পিটার কানের প্রতিবেদনে মুজিবনগর সরকার গঠন সম্পর্কিত সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল কীভাবে শপথ সমাপনের পরই ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন বৈদ্যনাথতলা জনপদটির ওপর (সাবেক কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রাম) পাকিস্তান আর্মির বর্বর আক্রমণ চলে এবং ক্ষণিকের মধ্যেই গ্রামটি জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে। সংবাদে বলা হয়, 'Only yards from the Indian border, Bangladesh held a ceremony in a mango grove at a village called Mujibnagar last saturday. The provisional government of Bangladesh was officially presented to the press, a proclamation of Independence, was read, and speakers made patriotic addresses.'

শপথ গ্রহণ করে দ্রুত এই সীমান্ত এলাকা ত্যাগ করার পর পাকিস্তান বিমানবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে উড়ে এসে বৈদ্যনাথতলার গ্রামটির ওপর কী তাণ্ডব চালিয়েছিল এই বর্ণনা প্রতিবেদনে রয়েছে। প্রতিবেদনের পরের লাইনেই বলা হয়, এই আনন্দঘন মুহূর্তটি অল্পতেই বিলীন হয়ে যায়। সেখানে পাকিস্তান আর্মি পরক্ষণেই এমন তাণ্ডব চালিয়েছে যে ক্ষণিকের মধ্যেই আশপাশের গ্রামের মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে। সেখানে শুধু কয়েকটি হাঁসকে একটি পুকুরে সাঁতার কাটতে দেখা যায়। 'But the glory fades quickly for Bangladesh. The day after ceremony, the village is deserted except for a few dozen residents. The reviewing stand still sits under a spreading mango tree, but only several ducks and goose strut around it.'

এই নতুন সরকারকে বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি ও সহযোগিতা প্রদানের সাড়া না দেওয়ায় বাঙালি হতাশ বলে পত্রিকায় বর্ণনা

গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

করা হয়। এই ব্যাপারে উপস্থিত বাঙালির বক্তব্য নিয়ে বলা হয়, তারা বার বার বিদেশি রাষ্ট্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে, বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যুদ্ধে বাঙালির পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু বাঙালি এই মুহূর্তে হতাশ। 'এইভাবে চললে আমরা মৃত্যুর মুখে চলে যাবো' (We will Die). প্রতিবেদনে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় বিমান হামলার খবরও প্রকাশ করে। পত্রিকার খবরে জানা যায়, পরের দিনই (১৮ই এপ্রিল) মেহেরপুর ও পাশের চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক পুনর্দখল করে নেওয়া হয়। পিটার কান জানান, বার বার আহ্বান, পাকিস্তান আর্মির বর্বর হামলা ও গণহত্যার বিষয় এবং প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েও বহির্বিশ্বের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। 'The expectations of Bangladesh may have been naive, but even far more practical minded men would have been disappointed at the world response.'

পত্রিকাটি আরও জানায়, 'বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের সরকরের মধ্যে কেবল রাশিয়া হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের প্রতি মৌখিক আহ্বান জানিয়েছে। বাঙালির নতুন সরকারের প্রতি এটি এক ধরনের নৈতিক সমর্থন। কিন্তু রেড চীন এই গৃহযুদ্ধে সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। কেবল পাকিস্তানের প্রতিবেশী কিন্তু শত্রুরাষ্ট্র ভারত নতুন গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং সীমান্ত এলাকা দিয়ে বেসরকারি সাহায্য ও শরণার্থী প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে, যদিও ভারত কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং সামরিক সহযোগিতা দিয়ে পূর্ণভাবে এগিয়ে আসেনি।'

পিটার কান আশাবাদী হয়ে মন্তব্য করেন যে, 'বাঙালির এই গৌরবের স্মৃতি তাদের জীবনের সঙ্গে গেঁথে থাকবে সর্বদা।' শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন বাঙালি কর্মকর্তার অনুভূতি প্রকাশ করে এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়; "The memory of glory lives on, however, Back on the Indian side of the border, a Bangladesh official is still dreaming about the previous day. 'It was a wonderful day, ' he declares." সাত জন মন্ত্রী এবং ২৭ জন জনপ্রতিনিধির সবাই উত্তম বক্তৃতা দিয়েছে, A fine ceremony.

মুজিবনগর সরকার গঠন নিয়ে আরও একটি মার্কিন সাময়িকী *টাইম* ম্যাগাজিনকে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে দেখা যায়। ২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত এক বৃহৎ রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'THE PUSH TOWARDS THE BORDERS.' *টাইম* সাময়িকীর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস শেপেডের তৈরি প্রতিবেদনটি ছিল এরূপ, 'বাঙালি বিদ্রোহীরা প্রবাসী সরকার গঠন করেছে, যদিও তাঁদের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রয়েছেন।' 'Despite the continued absence of their political leader, Sheikh Mujibur Rahman, who is thought to be in prison in West Pakistan, the rebels announced the formation of a Bangladesh provisional Government last week, who is at large in East Pakistan prudently chose the town of Meherpur, which lies a mere four miles from the Indian border.'

এই রিপোর্টে প্রবাসী সরকার গঠনের বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। রিপোর্টটি এরূপ, 'Despite the apparent determination of the Government to maintain its hold on East Bengal, the sheer human arithmetic of the situation seemed to indicate that the Bengalis would ultimately win freedom or atleast some form of regional autonomy.'

মুজিবনগর সরকার গঠনের সংবাদ পাকিস্তানি সামরিক সরকার ও সেনাবাহিনীকে বেশ ক্ষুব্ধ করেছিল, সে অবস্থা বুঝা যায় মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় পরের দিনই ব্যাপক বিমান হামলা পরিচালনার মধ্য দিয়ে।

ঢাকায় অবরুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া ছিল বিপরীত। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় ঢাকার পত্রিকাও মুজিবনগর সরকারকে 'ভারতের কাল্পনিক সরকার' বলে অভিহিত করে এবং বিমান আক্রমণের ধ্বংসযজ্ঞকে সমর্থন করে। এই আলোচনায় সরকার নিয়ন্ত্রিত ঢাকার তিনটি পত্রিকার নিউজ আইটেম উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকার সামরিক গভর্নর তখন জেনারেল টিক্কা খান। তার কঠোর নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম। দৈনিক *সংগ্রাম* ছিল জামায়েত ইসলামির মুখপত্র। কট্টর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী। ১৮ই এপ্রিল পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, 'তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী চুয়াডাঙ্গা দখল'। সংবাদে বলা হয়, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনেছে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর শহরটি। ভারতীয় প্রচারবিদরা কুষ্টিয়ার এই সীমান্তবর্তী শহরটিকে এতদিন যাবৎ তথাকথিত বাংলাদেশের রাজধানী বলে দাবি করে আসছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানরা কোনো গুলিবর্ষণ না করেই শহরটিতে প্রবেশ করে। তারা সেখানে ভারতের কাল্পনিক সরকারের কোনো সন্ধান পায়নি।' আসলে বিদেশি পত্রিকার খবরেই উল্লেখ ছিল যে, প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ শেষ করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছিল। একই সঙ্গে ব্যাপক আক্রমণের আশঙ্কায় এলাকার জনগণ নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানোর মতো সুযোগ পায়নি। ১৮ই এপ্রিলে ঢাকার *দৈনিক পূর্বদেশ* ঠিক একই ভাষায় রিপোর্ট ছাপে। সহজেই অনুমেয়, ঢাকার সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কার্যালয় থেকে যে ভাষায় সংবাদ লিখার নির্দেশ আসে সেভাবেই পত্রিকাগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল।

মুজিবনগর সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের পথ প্রশস্ত হয়। এই সরকারের গঠনের খবর বহির্বিশ্বে যেভাবে প্রচার হয় তা থেকে সে সময়ের কয়েকটি বিষয় প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। প্রথমত, পাকিস্তান সরকারের অস্থিরতা প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়ত, এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে মেহেরপুর জনপদে ব্যাপক সামরিক তৎপরতার খবর নিশ্চিত হওয়া যায়। একই সঙ্গে সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও দৃঢ়তা যে বৃদ্ধি পায় সে খবরও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত, নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থনের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র সরকারের বিভাজন ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ড. মো. এমরান জাহান : প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, emran430@yahoo.com

এসো হে বৈশাখ

ড. সরকার আবদুল মান্নান

নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত!
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

নববর্ষ। বাঙালি জীবনে নতুনের আবাহন। পুরাতনকে, অন্যায়কে, মিথ্যাকে, অসুন্দরকে বিদায় দিয়ে নতুনকে, ন্যায় ও সত্যকে, সুন্দর ও আনন্দকে বরণ করার সর্বজনীন উৎসব আমাদের নববর্ষ। এ হলো শত্রুতা ভুলে গিয়ে বন্ধুত্বের আহ্বানের সময়। ধর্ম নয়, জাতি নয়, নারী নয়, পুরুষ নয়, ধনী নয়, দরিদ্র নয়, বর্ণ নয়, পেশা নয়– এ হলো সর্বমানবীয় সম্মিলন। সত্য, সুন্দর ও আনন্দের সম্মিলন। এ হলো আমাদের জাতিগত সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ আয়োজন।

সংস্কৃতি কী– এই জিজ্ঞাসা নিয়ে অনেক কথা আছে এবং এর বহু রকম মীমাংসাও আছে। আবার চূড়ান্ত অর্থে কোনো মীমাংসা নেই। কেননা সংস্কৃতির রকমফেরের কোনো অন্ত নেই এবং উত্তর আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করারও কোনো সুযোগ নেই। কোনো একটি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কৃতি তো আছেই, তার সঙ্গে আছে বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের ঐক্য ও সৌন্দর্য। সংস্কৃতিগত এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে মোটা দাগে দুটি ভাগ আছে। এর একটি হলো কোনো জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কৃতি ও জাতিগত সংস্কৃতি।

ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির কাঠামোটি ধর্মীয় বিধিবিধান ও নিয়মনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নও এখানে অবান্তর। নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ তাদের বিশ্বাসের পথ ধরে কিংবা অনুশাসনের ভয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করেন। যেমন– সালাম, নমস্কার বা আদাব বিনিময় করা ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয়। একজন মুসলমান যে দেশের বা যে ভাষার মানুষ হোন না কেন, অন্য কারো সঙ্গে দেখা হলে তিনি কুশল বিনিময়ের পূর্বেই সালাম বিনিময় করবেন আরবি ভাষায়, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে।

কিন্তু জাতিগত সংস্কৃতির বিষয়টি ভিন্ন রকম। তবে ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক নয় এবং সম্পৃক্তও নয়। যেমন, গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম দেওয়ার বিষয়ে ইসলাম ধর্মে যে বিধানই থাকুক না কেন, জাতিগত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে হাজার বছর ধরে এই রীতি প্রচলিত আছে এবং এই ভূখণ্ডের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সবাই গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম করে থাকেন। উৎসবের বিষয়টিও তেমনি আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। সেই উৎসব ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয় হতে পারে, আবার জাতিগত সংস্কৃতির পরিচয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে।

আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ মূলত মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। কিন্তু সংগীত ও নৃত্য তাদের প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য বিষয়। সংগীত, চারু ও কারুকলা আমাদেরও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই শিক্ষা কখনোই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব পায়নি। অধিকন্তু নৃত্য, সংগীত এবং চারু ও কারুকলা একটি অবহেলিত, অপ্রয়োজনীয় ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ আফ্রিকান মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না– যিনি গান গাইতে জানেন না কিংবা নৃত্যে অপটু। এবং তাদের সেই গান ও নাচের মধ্যে হাজার বছরের আফ্রিকান সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠে। গভীর অরণ্য শাসিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শ্বাপদসংকুল জীবনের বিচিত্র প্রত্নরূপ তাদের এই শিল্পের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। আধুনিক আফ্রিকা তাদের সেই বিস্ময়কর প্রত্ন ইতিহাসকে অস্বীকার করেনি। অধিকন্তু তাদের শিল্পের প্রতিটি মাধ্যমে তারা বাস্তব, পরাবাস্তব, অধিবাস্তব ও প্রায় অবাস্তব জীবনের মূর্ত-বিমূর্ত অনুভবপুঞ্জকে বিচিত্র মোটিফে ধরতে চেয়েছেন। উৎসবপ্রিয় এই জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও মূর্ত হয়ে ওঠে বৃক্ষ-শাসিত শ্বাপদসংকুল জীবনের বিচিত্র আর্কেটাইপ। আর নৃত্যের মুদ্রা, সংগীতের তাল-লয়-ছন্দ এমনকি গার্হস্থ্য জীবনের বিচিত্র উপকরণের মধ্যেও থাকে তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের বিস্ময়কর প্রকাশ। এই বিপুল জীবন জিজ্ঞাসায় ধর্ম কখনই অন্তরায় সৃষ্টি করেনি কিংবা জাতিগত সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতির সংঘাতও সৃষ্টি হয়নি কখনো।

আমাদের দেশে ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বেশ কিছু উৎসব আছে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবগুলো বেশ জাঁকালো ও তাৎপর্যপূর্ণ। এদেশের মুসলিম সম্প্রদায় দুইটি ঈদকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, নামাজ পড়া, কোলাকুলি করা এবং আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া– এই হলো ঈদের দিনগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসবের পরিচয় এবং এই পুরো আয়োজনটি অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ধর্মভিত্তিক উৎসব থাকলেও এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য অপরিহার্য উৎসব নববর্ষ উদ্‌যাপন। অর্থাৎ নববর্ষ পালনই হলো এ দেশের মানুষের একমাত্র জাতিগত উৎসব– যার ভেতর দিয়ে বহু বিপরীতের ঐকতান সাধিত হয় এবং সর্বমানবীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়।

সকল সুন্দরের গোড়ায় থাকে সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টির পূর্বশর্ত হলো বৈচিত্র্য ও বিপরীতের ঐকতান। জলের সঙ্গে জল মিশালে কেবল জলের পরিমাণ বাড়ে, নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। তেমনি একই প্রকৃতি ও বিশ্বাসের মানুষের সমাবেশে লোকসংখ্যা বাড়ে, নতুন কোনো জীবনাদর্শ ও জীবনতৃষ্ণা তৈরি হয় না। একইভাবে সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও বিভা তৈরিতে কোনো একটি মাত্র বিশ্বাসের লোক দিয়ে হয় না– হয় বহুত্ববাদী জনগোষ্ঠীর সম্মিলনে। বাঙালি-জীবনে নববর্ষের উৎসব হলো সেই সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য যেখানে এদেশের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই এমন সম্প্রদায়ও আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এই উৎসবটি যে সর্বজনীনতা লাভ করেছে তার মূলেও আছে এ দেশের সর্বমানবীয় জীবনতৃষ্ণার ঐতিহ্য। এই জীবনতৃষ্ণা এ

দেশের হাজার বছরের সংস্কৃতির মাত্রা ও মাত্রান্তর। জাতিগতভাবে এ দেশের মানুষের মধ্যে সহনশীলতার যে ঐতিহ্য রয়েছে, রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে সর্বমানবীয় জীবনবোধ ও জীবনাকাঙ্ক্ষা রয়েছে– এই উৎসবের ভেতর দিয়ে আপন স্বভাবে তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

এই উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে সংগীত, নৃত্য, পালাগান, যাত্রা, পথনাটক, পুতুলনাচ, দোলনা, খেলাধুলা ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপুল বৈভব। আর খাদ্য-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে এই উৎসব যে মাহাত্ম্য লাভ করে তার কোনো তুলনা হয় না। এই উৎসবকে উপলক্ষ করে আমাদের নারী-পুরুষদের পোশাকে যে সব মোটিফ তৈরি করা হয় তার মধ্যেও থাকে অনন্য বাঙালি সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও প্রত্ন-ইতিহাস। চিরায়ত নকশিকাঁথার মোটিফগুলোকে অবলম্বন করে নতুন ধাঁচে কোনো কোনো পোশাকের মোটিফ নির্ধারণ করা হয়। কোথাওবা জিওমেট্রিক মোটিফ, কোথাওবা লোকজ আল্পনা এবং কোথাওবা অর্নামেন্টাল ও ফ্লোরাল। এর সঙ্গে থাকে বৈশাখের সাদা-কালো রঙের সঙ্গে কমলা, সবুজ, ক্রিম, সোনালি, নীল ও মেরুনসহ অসংখ্য উজ্জ্বল সব রঙের ব্যবহার। শুধু পোশাকে নয় বরং নববর্ষের পুরো আয়োজনের মধ্যে থাকে রং আর রঙের খেলা। মনের রঙের সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র রং মিশিয়ে সৃষ্টি হয় রঙের কোলাহল।

গ্রামীণ জীবনে নববর্ষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণের এক চিরায়ত বিশ্বাসের উৎসব। এর সঙ্গে কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, আছে সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের এক অসামান্য মহিমা। ফলে ধনী-দরিদ্র সবাই নববর্ষ উদ্‌যাপন করেন যুথবদ্ধ অবচেতনার জাতিগত ঐতিহ্যের গোপন এক প্রেরণা থেকে। ব্যক্তি মানুষের পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে গৃহসজ্জা পর্যন্ত এবং গ্রামীণ মেলা পর্যন্ত বিপুল আয়োজনের মধ্যে রং আর মোটিফের যে ব্যবহার লক্ষ করা যায় তার মধ্যে নিহিত থাকে জাতিগত সংস্কৃতির সর্বমানবীয় ঐতিহ্য। বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে যে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় সেই আয়োজনের সিংহভাগজুড়ে থাকে বাস্তব, চেতন ও অবচেতনের বিভিন্ন প্রাণীর মোটিফ অঙ্কিত প্ল্যাকার্ড এবং বাঁশ, বেত, মোটা কাগজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পশু-পাখি, মাছ, কুমির, ড্রাগন প্রভৃতির কাঠামোর ওপর অসাধারণ শিল্পকর্ম। আর থাকে মুখোশ। আল্পনায় থাকে বৃক্ষ, ফুল, ফল, মাছ, পশু-পাখি, বাদ্যযন্ত্র ও লোকজ জীবনে ব্যবহৃত বিচিত্র উপকরণের সমাহার। বিপুল এই আয়োজনে রঙের ব্যবহারের মধ্যেও থাকে ঐতিহ্যের মাত্রান্তরকে উন্মোচিত করার প্রয়াস। আর এই আয়োজনের চেতনামূলে থাকে সর্বমানবীয় কল্যাণ কামনা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার এবং বহুদিন ধরে এই উৎসবের শুরুতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ এবং শেষেও থাকেন তিনি। তাই আবারো স্মরণ নিই রবীন্দ্রনাথেরই–

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি;
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

ড. সরকার আবদুল মান্নান: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, drsharkaramannan@yahoo.com

স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট অব পোস্ট অফিস উদ্বোধন

খুলনার কয়রায় ১৯শে মার্চ বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট অব পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেন ক্রাউন প্রিন্সেস। ক্রাউন প্রিন্সেসের সফরকালে সুইডেনের Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade Mr. Johan Forssell, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তার সাথে ছিলেন।

এসময় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আমরা খুবই আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ও আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য যে কার্যক্রমগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস সেগুলোর মধ্যে স্মার্ট ডাক সার্ভিস পয়েন্ট পোস্ট অফিস উদ্বোধন করলেন। সরকার দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন, তিনশত ১৯টি পৌরসভা ও সকল সিটি করপোরেশনে ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছে। এসকল সেন্টার থেকে প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি মানুষ সেবা গ্রহণ করছেন। যার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের আট হাজার ডাকঘরকে মেইল ডেলিভারি সেন্টার থেকে সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে রূপান্তর করতে চান। তারই অংশ হিসেবে আমরা আজ একটি ডাকঘরকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট অব পোস্ট অফিস হিসেবে উদ্বোধন করলাম।

প্রতিবেদন: জিনিয়া আক্তার

নিবন্ধ

উৎসবের আর্থসামাজিক স্বার্থ

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

অপরের কল্যাণসাধনই সকল সমাজ দর্শনের মূল ভিত্তি। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'– এই মহান ব্রত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য সুখময় জীবনযাপন নিশ্চিত হয়। ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি, ব্যক্তি কল্যাণের ওপরই রচিত হয় সমষ্টিগত কল্যাণের সৌধ। পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন, একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ এবং অপরের আনন্দ-বেদনায় পরস্পরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। সামাজিক সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সামাজিক মূল্যবোধ, যা অভিন্ন সত্তা হিসেবে কাজ করে। এই মূল্যবোধ সহসা কিংবা আরোপিত নির্দেশের বলে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা স্থিতি আকারে প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে ধর্ম এক বিরাট গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই মানুষের জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অনুশাসনমালা মানুষের আচার-আচরণ-প্রবৃত্তি-প্রবণতার ওপর একটা গঠনমূলক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনা দান করে। মূলত ধর্মীয় বিধিবিধান মানুষের আত্মিক উন্নতি লাভের পথ নির্দেশ করে আর এই আত্মগত উন্নতির ওপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত তথা সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়ে থাকে।

ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে ধর্মের মূল আদর্শগুলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অপরের কল্যাণে নিবেদিত হতে উৎসাহিত করাই ধর্মীয় উৎসবগুলোর মূল লক্ষ্য। মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। সে নিজে একা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে জীবনযাপন করতে পারে না। কোনো না কোনো কারণে তাকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা তাকে বহির্মুখী করে তোলে। অন্যের সাথে বিভিন্ন লেনদেনে তাকে সম্পৃক্ত হতে হয়। এর ফলে সকলের সাথে তার একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলাকে লক্ষ্য করে গঠনমূলক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানাদি ধর্মীয় উৎসবগুলোতে পরিপালিত বা বাস্তবায়িত হয়। উৎসব এবং অনুষ্ঠান মাত্রই একটি সম্মিলন। সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিশেষ উপলক্ষে একত্র হয়। ব্যক্তি হয় সমষ্টির অংশ। এর ফলে ভাবের আদান-প্রদান হয়। সুখ-দুঃখের কথোপকথন হয়। আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগির একটা তাগিদ অনুভূত হয়। এমন ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ-সমস্যা সকলের সুখ-দুঃখ-সমস্যায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। একের দুঃখ অন্যের সুখের সাথে, একের বেদনা অন্যের আনন্দের সাথে, একের অভাব অন্যের প্রাচুর্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

ধর্মীয় উৎসবগুলো সাধারণত বছরের বিশেষ সময়ে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সকলের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ আসে– সংবৎসরের জমে থাকা দুঃখ-বেদনা-মনোমালিন্য দূর করার একটা উপলক্ষ তাতে মিলে। ধর্মীয় উৎসবগুলো প্রায়শই কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রেক্ষাপটে আনন্দের হেতু হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। আত্মকল্যাণ লাভের জন্য কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের পর আনন্দের সোপান হিসেবে এই উৎসবের আয়োজন। সে উৎসবে থাকে পরিতৃপ্তির আমেজ। আত্মোৎসর্গের পরিতৃপ্তিতেই অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। সে জন্য ধর্মীয় উৎসবগুলোতে দানখয়রাত করা অর্থাৎ বিত্তবান সমর্থরা বিত্তহীন অসমর্থদের সাহায্য করে, আনন্দে সকলে সমভাবে অংশগ্রহণ করে। অন্যের অতৃপ্তিকে নিজের অতৃপ্তি বলে মনে করে সবাই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আহার্য দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী এমনকি জীবজন্তু উৎসর্গ করা হয়ে থাকে এসব উৎসবগুলোতে। কিন্তু এগুলোর কোনো কিছুই সৃষ্টিকর্তার দরবারে সরাসরি পৌঁছায় না। বান্দার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছাটিই বিধাতার কাছে মুখ্য হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। এই ধূলি ধরায় উৎসর্গকৃত সব কিছুই করা হয় সকলের মাঝেই। যা কিছু উৎসর্গ করা হয়,

তা সবই আহার্য কিংবা মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা অন্যের ক্ষুধা ও অভাব মিটিয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যায় ধর্মীয় উৎসবের সকল কিছুই সামাজিকতার আদর্শ প্রতিফলনের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করে থাকে।

পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম ও সমাজে স্ব স্ব সংস্কৃতি ও অবকাঠামো অবয়বে উদ্‌যাপিত উৎসবাদিতে মানবিক মূল্যবোধের সৃজনশীল প্রেরণার, সখ্যতা, সৌহার্দ্য প্রকাশের অভিষেক ঘটে থাকে। নানান উপায়ে সম্প্রীতি বোধের বিকাশলাভ ঘটে থাকে, অবনিবনার পরিবর্তে বন্ধন, মতপার্থক্যের অবসানে সমঝোতার পরিবেশ সৃজিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, দেওয়ালিসহ নানান পূজা-পার্বণাদিতে আত্মশুদ্ধির আনন্দের, অপয়া অসুর সত্তার সংহার, সংবেদনশীলতার শুভ উদ্বোধন ঘটে থাকে। খ্রিষ্টীয় বড়ো দিনের উৎসব সংবৎসরের সকল বিভ্রান্তি-বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে অনাবিল আনন্দ-আচার-অনুষ্ঠানে নিবেদিত হওয়ার সুযোগ সমুপস্থিত করে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৎ চিন্তা, সৎ ধ্যান ও অহিংস অভেদ বুদ্ধি বিবেচনার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের পরিপালনীয় নির্বাণ অনুষ্ঠানাদিতে। সকল আয়োজন আপ্যায়নের মর্মবাণীই হলো সৃষ্টিকর্তার ইবাদত, তার সৃষ্টির সেবা ও সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে। সংহার নয় সেবাই পরম ধর্ম। সকল অশান্তি– কলহ-বিবাদে। শান্তির সম্ভাবনা শুধু সহযোগিতা-সমঝোতাতেই ।

সাম্য ও সামাজিক সংহতির ধর্ম ইসলামের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, আশুরা, শবে বরাত, শবে কদর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব উৎসবের মূল তাৎপর্য হলো আত্মশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের কঠোর ত্যাগ সাধনার প্রেক্ষাপটে আনন্দঘন সম্মিলন। গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দানখয়রাত করা, ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে এ সম্মিলনে শরিক হওয়া, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করার মাধ্যমে সামাজিকতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে থাকে। মোবারক মাস রমজানের পর আসে ঈদুল ফিতর। সুদীর্ঘ একমাস কঠোর সংযমের পর আসে আনন্দের উৎসব ঈদুল ফিতর। 'ঈদ' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ খুশি। ফিতরের আভিধানিক অর্থ 'ফিরে আসা'। রমজান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যে বিশেষ নিয়মকানুন পালিত হয় তা থেকে 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসা' হয় ঈদুল ফিতরের দিনে। ঈদের এই আনন্দ উৎসবে শরিক হওয়ার সামর্থ্য সকলের সমানভাবে থাকে না। সে জন্য ইসলামে সমাজের ধনী ও বিত্তবান সদস্যদের ওপর দরিদ্র ও বিত্তহীনদের মধ্যে জাকাত ও ফিতরা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র *কোরানে* সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে 'বিত্তবানদের সম্পদের ওপর বিত্তহীনদের হক আছে।' (৫১ সংখ্যক সূরা আয যারিয়াত, আয়াত ১৯) *কোরানের* এই অমোঘ নির্দেশ ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে জাকাত ও সদকা প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর হয়ে থাকে। বিধান রয়েছে, ঈদের নামাজ আদায়ের আগেই জাকাত ও ফিতরা প্রদান করতে হবে। এটা ঈদুল ফিতরের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য। উন্মুক্ত ময়দানে ধনী-দরিদ্র, উঁচুনীচু, সাদাকালোর সকল ভেদাভেদ ভুলে ঈদের জামাতে শামিল হওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মিলনে পাড়াপড়শি থেকে শুরু করে সকল পরিচিত-অপরিচিতের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। নামাজ শেষে কোলাকুলির মাধ্যমে সবাই সকল ভেদাভেদ ও মনোমালিন্য ভুলতে চেষ্টা করে। ঈদের দিনে সকলে সাধ্যমতো নতুন পোশাক পরিধান করে। পুরাতন বিবাদ-বিসংবাদ-দুঃখ-কষ্ট থেকে নতুনতর জীবনবোধ ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রতীকী প্রকাশ ঘটে থাকে এর মধ্যে। একে অন্যের বাসায় পালাক্রমে দাওয়াত খাওয়া, যাতায়াতের মাধ্যমে সামাজিক সখ্যতার ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।

ঈদুল ফিতরের ন্যায় ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের মধ্যেও রয়েছে বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য। হজরত ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মহান স্মৃতিকে স্মরণ করে পালিত হয় ঈদুল আজহা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানির মাধ্যমে আত্মোৎসর্গের পরিচয় দেওয়া হয়। এই পশু কোরবানির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নিজের পশু প্রবৃত্তি, অসৎ উদ্দেশ্য ও হীনম্মন্যতাকেই কোরবানি করা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই বিশেষ ঈদ উৎসবে নিজের চরিত্র ও কুপ্রবৃত্তিকে সংশোধন করার সুযোগ আসে। সামাজিক কল্যাণসাধনে সংশোধিত মানব চরিত্র বলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোরবানির মাংস আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার যে বিধান তার মধ্যে নিহিত রয়েছে সামাজিক সমতার মহান আদর্শ। হজ পালন ঈদুল আজহা উৎসবের একটি বিশেষ অংশ। পবিত্র হজ অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানগণ সমবেত হন এক মহা সম্মিলনে। ভাষা ও বর্ণগত, দেশ ও আর্থিক অবস্থানগত সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলের অভিন্ন মিলনক্ষেত্র কাবা শরিফে একই পোশাকে, একই ভাষায়, একই রীতি-রেওয়াজের মাধ্যমে যে ঐকতান ধ্বনিত হয় তার চাইতে বড়ো ধরনের কোনো সাম্য-মৈত্রীর সম্মেলন বিশ্বের কোথায়ও অনুষ্ঠিত হয় না। হজ পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রং ও গোত্রের মানুষের মধ্যে এক অনির্বচনীয় সখ্যতা সংস্থাপিত হয়। বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের, যা অনুপম আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে।

শবে মেরাজ, শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে নিজের অপরাধ মার্জনা ও আল্লাহর রহমত কামনার জন্য বিশেষ ইবাদত করা হয়। এসব মহান রাতে আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা, তা প্রকারান্তরে সকলের জন্য কল্যাণ বহন করে আনে।

আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক, বাঙালির প্রাণের নববর্ষের উৎসব, বাংলা বর্ষের প্রথম দিবস পহেলা বৈশাখ, শুধু বারো মাসের তেরো পার্বণের অন্যতমটি নয়– এটির সাথে সমসাময়িক আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার চালচিত্রের পরিচয় বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনটির উদ্‌যাপনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পহেলা বৈশাখের আগের দিন 'চৈত্র সংক্রান্তি'তে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হয় অনেক অনুষ্ঠান ও সংস্কারবান্ধব রীতিনীতি পালনের পর্ব। পরের দিন পহেলা বৈশাখ যেন নির্ভেজাল-নির্ভার-নিরাপদ আনন্দে শুরু হতে পারে সে কারণে সংবৎসরের যাবতীয় লেনদেন-বোঝাপড়ার সালতামামি চলে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। আগের বছরের শেষের হিসাবকিতাব মেলানোর মধ্যে নতুন বছরের যাত্রার বেগ ও মাত্রা নির্ভর করে। শুচি শুভ্র অবয়বে, মনের সকল ক্ষোভ, খেদ, বেদনা ও বিমর্ষভাব কাটিয়ে আনন্দ উৎসবে নতুন বছরকে নতুন দিনে বরণ করাই উদ্দেশ্য।

নতুন বছরের নতুন খাতা খোলা হবে ব্যাবসাবাণিজ্যের, কেনাবেচার, দায়দেনার লেনদেনের। হালখাতা তাই আর্থসামাজিক জীবনায়নে নতুন প্রেরণা প্রাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম উপলক্ষ। হালখাতা শব্দের মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনযাপনের একটা প্রাকরণিক পদ্ধতির নির্দেশনা আছে। নতুন দিনে নতুনভাবে সবকিছু শুরুর মধ্যে একটা পূতপবিত্র ও প্রসারিত মন প্রসারণের, হৃদয় উজাড়করণের, মনোযোগের বিবেচনার ব্যাপার জড়িত। সম্রাট আকবর 'ফসলী সন' হিসেবে বাংলা বর্ষ প্রবর্তন করেছিলেন। পহেলা বৈশাখ সেই সনের প্রথম দিন হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। সে সময় থেকে চৈত্র সংক্রান্তি অধুনা 'জুন মাসের তিরিশ তারিখে'র মতো। চৈত্র মাসে অনেক কাজ শেষ হওয়ার, শুরুর নয়। চৈত্র মাস স্বভাবে শুষ্ক, রুক্ষ, রক্তচক্ষুর ন্যায় তার চাহনি। সারা বছরের সব ভালোমন্দের মেজাজ চৈত্র মাসের মগজে ঠাঁই নেয়। বিয়ের কাজের মতো শুভকাজ কেউ চৈত্র মাসে ফেলতে চায় না। কিন্তু বৈশাখ? সে যেন নতুন কিছু গড়ার নতুন কিছু শুরুর জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ হাজির করে। রাস্তায় আল্পনা এঁকে এই নতুন সময়কে স্বাগত জানানো হয়। নতুন পোশাক পরে সবাই নতুন খুশির মেজাজে দিন বা বছর শুরু করতে চায়। রুক্ষ চৈত্র থেকে বিমল আনন্দের বৈশাখে বিবর্তন ঘটে মানুষের, প্রকারান্তরে তার মনের বনে লাগে শুভ্র সূচির ছোঁয়া, জাগে প্রসারিত হৃদয়ের দোলা। মাত্র একদিন আগে সে ছিল উদ্বিগ্ন, উত্তপ্ত, নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও মনমরা।

প্রতীয়মান হয় হালখাতা উৎসব ক্রমশ তার কার্যকারিতার তাৎপর্য হারাচ্ছে। বাড়ছে না হালখাতা (হিসাব রাখার নতুন খাতা) ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ। নববর্ষ উদ্‌যাপনে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে (অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল খাতে) কর্মকাণ্ড বেড়েছে। যা দেখে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মনে হয়েছে অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে। মনে হয়েছে কর্মচাঞ্চল্য বেড়েছে মানুষের মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবহমান উৎসবে মানুষের অংশগ্রহণের মাত্রা বাজারে বৈকি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সে চাঞ্চল্যে নিতান্ত নানাবিধ ব্যয়ের উৎসবে মাতামাতি বেড়েছে। কিন্তু পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি চাহিদা অনুযায়ী না বাড়ায় সরবরাহে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড়ো বৈসাদৃশ্য ও বেমানান বাড়াবাড়িতে সমাজ ও অর্থনীতির দৈন্য ও দুর্দশা ফুটে উঠেছে। বৈশাখের যে আবহমান সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ– ভেদাভেদ ভুলে পুরানো দিনের বেদনা ও বৈষম্যের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন দিনের আলো অবগাহনের মতো গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা ও পরিতৃপ্তিকে উপভোগ করার চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে কতিপয় পণ্য ও সেবার মূল্যবৃদ্ধির এই অতি অস্বাভাবিক আচরণে।

প্রভূত পরিসংখ্যান, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বৈষম্য বাড়ছে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের ও নাগরিকের মধ্যে, করদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে, শিল্পমালিক ও শ্রমিকের মধ্যে, নীতি নির্ধারকের সাথে পোষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, উৎপাদনকারীর সাথে খুচরা ক্রেতার, ব্যাংকের আমানতকারীদের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার, সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যাশার সাথে আর্থিক খরচে কর্মনৈপুণ্যের, রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যয় ব্যবস্থাপনার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর সাথে সাধারণ মানুষের। সমাজে অর্থ ক্ষেত্রে অপব্যয়ের জৌলুসের চাকচিক্যের ডামাডোলকে মনে হতেই পারে এটি পুঁজিবাদী মানসিকতা প্রস্তুত এবং বৈষম্য বিলাসী উদাসীন ঊর্ধ্বতনদের ইচ্ছা ও অভিলাষ উৎসারিত। অর্থনৈতিক বৈষম্য বিভাজন থেকে মুক্তির সংগ্রামে জয়ী একটি স্বাধীন সার্বভৌম অর্থনীতির প্রাণবায়ু যে জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও ন্যায়নীতি নির্ভরতা, নৈতিক মনোবল ও মূল্যবোধ তার সার্বিক অবস্থান ও উপস্থিতি আপাত প্রাণচাঞ্চল্যে ফিরে আসা অবয়বে উৎসাহিতবোধ করা চলে না। সেগুলো ক্রমশ নির্বাসনে না পাঠিয়ে সাময়িক এই প্রগলভতায় সমাজ প্রকৃতপক্ষে এগুচ্ছে না পিছাচ্ছে সেটা উপলব্ধিতে আসা দরকার।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সরকারের সাবেক সচিব, এন বি আরের সাবেক চেয়ারম্যান, mazid.muhammad@gmail.com

রমজান ও ঈদুল ফিতরের মাহাত্ম্য

খালেদা বেগম

আট বছরের মুহাম্মদের আজ দ্বিতীয় রোজা। প্রথম রোজাটি রেখেছিল উইকঅ্যান্ডে বাসায় মায়ের তত্ত্বাবধানে। স্কুল থাকায় আজ রোজা নিয়েই সে স্কুলে এসেছে। সতর্কতাবশত মা মুহাম্মদের সাথে লাঞ্চ বক্স ও পানির বোতল দিয়ে দিয়েছেন– যদি শিশুটি বেলা বাড়লে রোজা ধরে রাখতে অপারগ হয়। লাঞ্চ ব্রেকের সময় সব ক্লাসের সব বাচ্চারা যখন খাবার খাচ্ছিল মুহাম্মদ লাঞ্চ বক্স পাশে নিয়ে স্কুলের এক কোণে বসে পাখিদের উড়াউড়ি দেখছিল। বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন শ্রেণি শিক্ষক মিসেস বেস্টার। তিনি কাছে এসে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেলেন, 'মুহাম্মদ তুমি তোমার খাবার খাচ্ছো না কেন? লাঞ্চ ব্রেক তো শেষের দিকে।' বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে একটু বড়ো বড়ো ভাব নিয়ে মুহাম্মদ বলে, 'Today I am fasting miss.'। 'wow! that's great.' তার মানে তুমি আজ কোনো খাবার খাবে না? 'But you can have some drink my dear.' মুহাম্মদ মুচকি হেসে বলল, 'না মিস, আমি ইফতার পর্যন্ত পানিও পান করব না আজ।'

ইফতার সম্পর্কে মিসেস বেস্টারের ধারণা থাকলেও রোজায় যে পানি পর্যন্ত পান করা যায় না তা জানতেন না। তাইতো অবাক হয়ে বললেন, 'Not even a drink?' মিষ্টি হেসে মুহাম্মদ বলল, 'Yes Mrs. Bester, not even a drink.'

Not even a drink, Not even a drink... কথা কয়টি Mrs. Bester-এর কানে একটি মিষ্টি গানের মতো বাজতে থাকে সুর করে। বাড়িতে যেয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমনকি ঘুমানোর সময়ও মনে হলো ছোটো শিশু মুহাম্মদের কথা... কী অসম্ভব মানসিক শক্তি শিশুটির। সৃষ্টিকর্তার প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস নিয়ে সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও সে খাবার খাচ্ছে না, কোনো পানীয় পান করছে না। পাহাড়ের উপর Mrs. Bester-এর বাড়ি। বিকেলে কফির মগ হাতে বারান্দায় বসে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন পাহাড়ি এলাকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে আর ভাবতে থাকেন সৃষ্টিকর্তার মহানুভবতার কথা, সেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি শিশু মুহাম্মদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা।

মুহাম্মদের মা সাবিরা বাংলাদেশের মেয়ে, অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। নিজে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের পাশাপাশি ছেলে মুহাম্মদকে নামাজ-রোজাসহ ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলো সম্পর্কে নিয়মিতই গল্পের ছলে শেখানোর চেষ্টা করেন। এবারের রমজানে মুহাম্মদ রোজা রাখতে চাইলে সাবিরা না করেননি। কারণ ছোটোবেলা থেকে কিছু কিছু রোজা না করলে বড়ো হয়ে রোজা রাখতে কষ্ট হবে।

ইসলামি বর্ষপঞ্জিকার নবম মাসে মুসলিম জাহানে খুশির বারতা নিয়ে হাজির হয় রমজান, যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। রমজান সিয়াম সাধনার ও আত্মশুদ্ধির মাস; কল্যাণ ও বরকতের মাস; রহমত ও মাগফেরাত এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের মাস। বরকতময় এ মাসে বান্দার একটি ইবাদতের নেকি ১০ গুণ থেকে (ক্ষেত্র বিশেষে) ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রোজা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করব।' (*বুখারি হাদিস:* ১৮৯৪)। তাই রমজানে বেশি করে নামাজ আদায় ও অন্যান্য নেক আমল পালন ও তওবা ইস্তিগফার করতে হবে। যাতে করে মহান আল্লাহতায়ালার মেহেরেবানি লাভের পাশাপাশি অতীতকালের পাপসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। রমজানের মাসব্যাপী ইবাদত বন্দেগি সৎকর্ম ও সংযম পালন মিথ্যা বলা, লোভ-লালসা, হিংসাদ্বেষসহ সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থাকার যে শিক্ষা মানুষ লাভ করে তা তাকে একটি সৎ ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এতে করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ হয় কলুষমুক্ত।

আল্লাহর প্রতি রোজাদারের ভয় ও ভালোবাসার শক্তি এতই প্রবল যে, তার বান্দারা এমনকি মুহাম্মদের মতো ছোটো ছোটো শিশুরা গোপনে হলেও এক ঢোক পানি পান করে না। কেউ সামনে নেই বা কেউ দেখছে না নির্জন স্থানে একাকী বান্দা/বান্দি হালাল খাবার, হালাল পানীয় সামনে থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করছে না। এর মূলে রয়েছে রোজাদারের আত্মিক, নৈতিক ও তাকওয়ার

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ১১ই এপ্রিল ২০২৪ ঢাকায় জাতীয় ঈদগাহে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় শেষে মোনাজাত করেন –পিআইডি

শক্তি। রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। তাকওয়া মানে সকল ধরনের খারাপ কাজের বিষয়ে সতর্কতা, সাবধানতা, আত্মরক্ষা অর্থাৎ গুনাহ থেকে দূরে থাকা।

মাহে রমজানের ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো তারাবির নামাজ। রোজা শুরু হয় এ নামাজের মধ্য দিয়ে। রমজানের চাঁদ দেখা গেলেই মসজিদে মসজিদে মাইকে ঘোষিত হয় তারাবির নামাজের সময়। সকল শ্রেণির মুসলমানগণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ নামাজে যোগদান করে। তারাবির নামাজের বিশেষত্ব হলো মসজিদে পবিত্র *কোরান শরিফ* খতমের মাধ্যমে মাসব্যাপী তারাবি সম্পন্ন করা। রোজার সাথে তারাবির নামাজের গভীর সংযোগ প্রসঙ্গে নবী করিম (স.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য তারাবির নামাজকে সুন্নত করেছি; অতএব যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমজানে দিনে রোজা পালন করবে ও রাতে তারাবির নামাজ আদায় করবে, সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাতক মাতৃগর্ভ থেকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) ভূমিষ্ঠ হয়। (*নাসায়ি শরিফ*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৯)।

এ মাসেই নাজিল হয় পবিত্র *কোরান*। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত এ মাসে বেশি বেশি *কোরান* তেলাওয়াত করা, বোঝা এবং *কোরানের* নির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। রমজানে *কোরান* তেলাওয়াত করা এবং তা অধ্যয়নের ফজিলত ও উপকারিতা অনেক বেশি। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে *কোরান* তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে– 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত জাগরণ করুন, কিছু অংশ ছাড়া। অর্ধরাত কিংবা তার চেয়ে অল্প অথবা তার চেয়ে বেশি। আর *কোরান* তেলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে, সুস্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে।' (সুরা মুজাম্মিল: আয়াত ১-৪)। *কোরান* নাজিলের মাসে বেশি বেশি *কোরান* তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা অন্য মাসের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়ার উপায়। এটি শুধু পবিত্র রমজান মাসের বিশেষ বরকত। আর এতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এ কারণেই হাদিসে পাকে *কোরান* তেলাওয়াতকে 'আফদালুল ইবাদত বা সর্বোত্তম ইবাদত' বলা হয়েছে।

পবিত্র রমজানে শরিয়তের পক্ষ থেকে ছোটো-বড়ো সব ধরনের গুনাহ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এসেছে। এ জন্য রোজা পালনকারীদের সব ধরনের তাকওয়াবিরোধী হারাম কাজ ও মিথ্যা কথা বলা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে রাসুল (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি (সাওম রেখে) মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী কাজ করা বর্জন করে না তবে তার শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয় বর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই।' হাদিসে বলা আছে রোজা রেখে অশ্লীল কথা বলা এবং শোরগোল ও চেঁচামেচি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো জাকাত প্রদান। রমজানের দান-সদকাসহ সকল উত্তম আমলের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় বলে এ মাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ জাকাতের অর্থ বিতরণে উৎসাহী হন। এর ফলে সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য কমে আসে। তাছাড়া ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদের নামাজের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই যেন ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারে তাই জাকাত-ফিতরার এ ব্যবস্থা। তবে জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধিবিধান মেনে দান করা উচিত। দানের প্রচার দান গ্রহণকারীর জন্য বিব্রতকর এমনকি অনেক সময় প্রাণহানিকরও হতে পারে। যেমন আমাদের দেশে জাকাতের কাপড় বিতরণে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণের মতো দুঃখজনক ঘটনার কথা শুনতে পাই।

রোজা আত্মিক পরিশুদ্ধির পাশাপাশি মানুষের শারীরিক কল্যাণও বয়ে আনে। রোজার উপকারিতা নিয়ে গবেষণা করে ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপানি গবেষক ও বিজ্ঞানী ওশিনরি ওসুমি। তিনি রোজাকে বলেন 'অটো ফেজি' (Auto Phasy) যা একটি গ্রিক শব্দ। Auto অর্থ নিজে নিজে এবং Phasy অর্থ খাওয়া। রোজা পালনের কালে শরীরের কোষগুলো বাহির থেকে কোনো খাবার না পেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে তখন চিকিৎসাবিদ্যার ভাষায় তাকে 'অটো ফেজি' বলে। এতে করে আমাদের শরীরে কোষসমূহ পরিষ্কার হয়, যা ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের মতো বড়ো ধরনের রোগের প্রতিরোধ করে।

ইফতার ও সেহরি রোজাদারের জন্য দুটি প্রধান নিয়ামত। বলা হয় রোজাদারের দুই খুশি, একটি হলো– রোজাদারগণ পরকালে লাভ করবেন পরম আরাধ্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাক্ষাৎ। আরেকটি হলো– ইফতার। সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকার পরে ইফতারের প্রস্তুতি ও খাদ্য-পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে রোজাদার লাভ করেন অনাবিল আনন্দ। ইফতার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা রাত শুরু হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো'। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭)। যারা দ্রুত ইফতার করেন সেসব বান্দা আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়। (*সুনানে তিরমিযি*: ৭০০)। যে-কোনো হালাল বস্তু দ্বারা ইফতার করা যায়। তবে খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। যদি খেজুর না থাকে তাহলে কেবল পানি দ্বারাও ইফতার করা যায়। রোজার নিয়তে সেহরি খাওয়া সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সেহরি খাও। কেননা সেহরিতে বরকত আছে। (*সহিহ বুখারি*: ১৯২৩)। সেহরির বরকত ও কল্যাণ নানাবিধ উপায়ে অর্জিত হয়। যেমন: এর দ্বারা ইবাদতের শক্তি অর্জিত হয়, দেহ-মনে উদ্যমতা আসে। ক্ষুধার তাড়নায় সৃষ্ট প্রবৃত্তির বাসনা হ্রাস পায়। বিশেষত সেহরির সময় তাহাজ্জুদ, ইস্তিগফার ও দোয়া-মোনাজাতের সুযোগ লাভ হয়। সেহরি ও ইফতারের সময় সামর্থ্যবান লোকদের প্রচুর খাওয়ার সুযোগ থাকলেও সুস্থতার জন্য পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। কারণ দেহ-মন ভালো থাকলে ইবাদত করা যেমন সহজ হয়, তেমনি তা আনন্দমুখর হয়।

রোজাদারদের জন্য রমজান এক আনন্দের মাস। সিয়াম সাধনা, ইফতারি, তারাবি, তাহাজ্জুদ, *কোরান* পাঠ, সেহরি সব মিলিয়ে এক অপার্থিব আনন্দে কাটে সময়। সবকিছুর মতো এক সময় শেষ হয় পবিত্র রমজান মাস। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক বুক শূন্যতা নিয়ে বিদায় দেয় রমজানকে। তাইতো বিদায় বেলায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানের চোখ হয়ে ওঠে আর্দ্র। মোনাজাতে দুহাত উঠে আল্লাহর দরবারে, প্রার্থনা করে নিজেদের মঙ্গল ও মৃত আপনজনের জন্য।

রমজান যেমন আনন্দময় তেমনি রোজাদারকে করতে হয় ভোগ-বিলাস ত্যাগ। এই ত্যাগ-তিতীক্ষা, কষ্ট ও কঠোর ইবাদতের পর আনন্দের বারতা নিয়ে আসে শাওয়াল মাস যার প্রথম দিনেই পালিত হয় ঈদুল ফিতর। এ দিনটি হলো সারা বিশ্বের মুসলমানদের মহামিলনের দিন। এ দিন সকালে মুসলমানগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকাত ঈদের ওয়াজিব নামাজ পড়েন। ঈদুল ফিতরের নামাজে যাওয়ার পূর্বে রোজার একটি বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিবদুঃখীদের মধ্যে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করা হয় তাকে বলা হয় সাদাকাতুল ফিতর। আল্লাহ রাবুল আলামিন মুসলমানদের জন্য ঈদের যে আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন, সমাজের গরিবরা যেন সে আনন্দ থেকে বাদ না যায় সে ব্যাপারে সমাজের বিত্তশালীদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

ঈদের নামাজের পর মুসল্লিদের কোলাকুলির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা সাধ্যমতো নতুন জামাকাপড় পরে বেড়াতে বের হয় এবং তারা প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যায়। ঈদের দিন সব পরিবারেই সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো রান্নাবান্না ও মেহমান আপ্যায়ন হয়। এ দিন সবার বাড়িতে সবাই মেহমান। এতে করে সামাজিক সৌহার্দ্য বাড়ে। গ্রাম ও শহরে জমে ঈদের মেলা। সেখানে শিশুরা তাদের পছন্দমতো খেলনা খুঁজে পায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে চটপটি-ফুচকার দোকান। অনেক জায়গায় মাইকে গানও বাজনো হয়। সব মিলিয়ে পুরো এলাকা ভরে ওঠে উৎসবের আমেজে।

এ বিষয়ে মহানবী (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আমাদের মুসলমানদের উৎসব হলো ঈদ।' (*বুখারি ও মুসলিম শরীফ*)। বছরে আমাদের দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ঈদের দিন সকালে সকল মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকাত ঈদের ওয়াজিব নামাজ পড়েন। মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। ঈদ মানে আনন্দ এবং ফিতর অর্থ সাওয়ম বা রোজা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সিয়াম ভঙ্গের আনন্দ। সুদীর্ঘ এক মাস আল্লাহর নির্দেশ মতো রোজা পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এ দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ উৎসব করেন বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ করা ওয়াজিব– (১) ফিতরা দেওয়া এবং (২) ঈদের দুই রাকাত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করা। ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টি কাজ করা সুন্নাত। যেমন: (১) শরিয়তের মধ্যে থেকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত হওয়া, (২) গোসল করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরা, (৫) খুশবু ব্যবহার করা, (৬) ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, (৭) ফজরের নামাজের পরই সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া, (৮) মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়া (ঈদগাহে যাওয়ার আগে), (৯) ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতরা আদায় করা, (১০) ঈদের নামাজ মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে গিয়ে পড়া, (১১) ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য রাস্তায় ফিরে আসা, (১২) ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং (১৩) ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির অর্থাৎ জোরে জোরে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহি-ল-হামদ বলা।

এক মাসব্যাপী সংযম, সিয়াম সাধনা, ইফতার, তারাবি, তাহাজ্জুদ, সেহরি ও *কোরান* তেলাওয়াতের মাধ্যমে একটি পবিত্র ও সুন্দর সময়যাপন করে বিশ্বের মুসলমানগণ। তাকওয়া অর্জন, ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা, সহমর্মী হওয়া, পরনিন্দা পরিহার, সংযমের শিক্ষা, আল্লাহভীতি, মিথ্যা পরিত্যাগ, অহেতুক কাজ বর্জন, ধৈর্য ধারণ করা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ে রমজান মাসে আমাদের যে অর্জন তা যেন সারাজীবন কাজে লাগাতে পারি সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা থাকতে হবে। সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সবার মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের যে চেতনা তা সকলের মাঝে সবসময় জাগ্রত থাকুক– এটাই সকলের কামনা।

খালেদা বেগম: ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, bkhaleda9@gmail.com

তামাক ও মাদকাসক্তি পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী

বাংলাদেশে অনেক সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। তার মধ্যে মাদকাসক্তি বড়ো একটি সমস্যা এবং এটি বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্তি একটি রোগ। মাদকাসক্ত ব্যক্তির আসক্তি তাকে মানসিক ও শারীরিক রোগসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্য, ধূমপান ও তামাক সেবন মানুষের অকালমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যহানির অন্যতম প্রধান কারণ। মাদকের নেশায় বুদ হয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মের বিপথগামিতাও সময়ের বড়ো চ্যালেঞ্জ। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের বড়ো অংশের জনগোষ্ঠী কিশোর-তরুণ, যে কারণে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে বলা হয় ইয়ুথ ডিভিডেন্ট। বাংলাদেশে ৪৯% মানুষের বয়স ২৪ বা এর নীচে। অর্থাৎ ৪৯% জনগোষ্ঠী বয়সে তরুণ। অর্থাৎ দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ৫৬ লক্ষ। মাদক ব্যবসায়ীরা এই কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীকে মাদকের ভোক্তা হিসেবে পেতে চায়। সরকার ইতোমধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন।

বেসরকারি হিসাব মতে, দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ। মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগই তরুণ। তাদের অধিকাংশ আবার শিক্ষার্থী। মাদকে তরুণ-তরুণীরাই বেশি ঝুঁকছেন। ধারণা করা হচ্ছে– আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ মাদকাসক্তদের সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর তথ্যমতে, প্রতি মাসেই ঢাকার ৫০ থানায় গড়ে দেড় হাজার মাদকের মামলা নথিভুক্ত হয়। এমনকি করোনা দুর্যোগের মধ্যেও এমন চিত্র দেখা গেছে। করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যেও মাদকের চোরাচালান ও অবৈধ পাচার অব্যাহত ছিল। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারা রক্ষা করা যায়নি। অথচ এই মহাদুর্যোগেও মাদক কারবারি চক্র মাদকের বিস্তার চালিয়ে গেছে। মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সকল বাহিনী– পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনী করোনাভাইরাস সুরক্ষা কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়েছে মাদক কারবারি চক্রগুলো। এখনও বিভিন্ন কৌশলে দেশে মাদকের চালান আনছে তারা। বিভিন্ন যানবাহন যেমন: অ্যাম্বুলেন্স, নিত্যপণ্য পরিবহণের গাড়িতে করে ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন নিয়ে আসছে কারবারিরা। ডিএনসির তথ্যানুসারে, দেশের প্রায় ১০ লাখ মানুষ মাদক চোরাকারবারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এর মধ্যে মাদক পাচারে এক লাখ নারী ও শিশুকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও টেকনাফের ইয়াবা কারবারিরা ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবার চালান পাঠায়। কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো পার্সেলে এমনকি ত্রাণ বিতরণ এবং ওষুধ কেনাসহ বিভিন্ন অজুহাতে মাদক বিক্রি করছে তারা। বাংলাদেশে গবেষকরা ইতোমধ্যে মাদকাসক্তদের শতকরা ৯০ ভাগ কিশোর-তরুণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা ৯৮% ভাগই ধূমপায়ী এবং তার মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগই বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত। ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও খুনসহ রাজধানীতে সংঘটিত অধিকাংশ অপরাধের সঙ্গেই মাদকাসক্তির সম্পর্ক রয়েছে। একটি সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১০ বছরে মাদকাসক্তির কারণে প্রায় ২০০ পিতামাতা নিজ সন্তানের হাতে খুন হয়েছে।

জাতিসংঘ বলছে, অনেক মাদকাসক্ত বিকল্প হিসেবে আরও মারাত্মক ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য গ্রহণ করছে। এরই মধ্যে অনেক দেশে হেরোইন স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। সেসব দেশে এখন এমন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং শরীরের ওপর হেরোইনের চেয়েও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। মাদকাসক্তরা অনেকেই ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে বিভিন্ন নেশাদ্রব্য প্রয়োগ করছে এবং একই সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করছে। ফলে এইচআইভি বা এইডস অথবা হেপাটাইটিস-বি কিংবা সি ইত্যাদি রক্তবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

একটি ভয়ংকর উদ্বেগের কারণ হলো, ইয়াবা গ্রহণকারী শতকরা ৮৫ ভাগই তরুণ যুবসমাজ। যার ফলে এসব ইয়াবা গ্রহণকারী মাদকাসক্তরা নানান ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের কিডনি, লিভার ছাড়াও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, জীবনীশক্তি ধ্বংসকারী ইয়াবা সেবনকারীরা অল্প সময়ের মধ্যেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন এবং যৌনশক্তি হারিয়ে ফেলছেন চিরতরে। বিভিন্ন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ইয়াবা আসক্তদের ওপর পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এসব তথ্য জানিয়েছেন। সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে প্রায় ১৫ হাজারের অধিক মাদকাসক্ত চিকিৎসা নিচ্ছেন। একটানা মাত্র দুই-আড়াই বছর ইয়াবা সেবনের ফলেই তারা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাদের নার্ভগুলো সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যেই দেশে ইয়াবা আসক্তির সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাদক গ্রহণকারীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সিসা। সিসা সেবন সিগারেটের মতোই ক্ষতিকর। সিসা অথবা হার্বাল তামাকের কারণে মানুষ উচ্চমাত্রার কার্বন মনোক্সাইড জনিত সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, একবার সিসা সেবনে একটি সিগারেটের চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশি কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উচ্চমাত্রার কার্বন মনোক্সাইডে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এবং অচেতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইতোমধ্যে অনেকে ই-সিগারেটে আসক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ই-সিগারেটের মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং পরবর্তীতে মাদকের নেশায় আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের প্রথম দিন থেকেই মাদকবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সারা দেশে মাদকবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান চলছে এবং প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে। দেশের উন্নয়ন যেভাবে চলছে তাতে মাদক দেশের উন্নয়নে অন্যতম বাধা

বলে মনে করছে বর্তমান সরকার। এই বাধা দূর করতে মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলার কথা ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মাদকসহ গ্রেপ্তারকৃতরা এবং মাদক ব্যবসায়ীরা যাতে জামিনে ছাড়া না পায়, এজন্য নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে মাদক বিক্রেতা, মাদকের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক চক্রের সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে তালিকাভুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে। লক্ষ করা গেছে, মাদকের সঙ্গে মানি লন্ডারিং আইনে মামলার যোগসূত্র রয়েছে। তাই মাদকের বিষয়টি বর্তমান সরকারের জন্য বিশেষভাবে জরুরি। ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে হাজার খানেক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তারও হয়েছে। সেই সাথে লক্ষ লক্ষ ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদক উদ্ধার হয়েছে ।

সরকারের একটি সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বিষয়টি হচ্ছে, সরকারি চাকরিতে ঢোকার আগে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বা মাদক পরীক্ষা করা হবে। যাদের ডোপ টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হবে, তিনি চাকরির জন্য অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৮-এর খসড়া/ প্রস্তাবিত আইন সংশোধন; সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ আইন মাদক ব্যাবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবিসহ অন্য বাহিনীগুলোও এখন মাদক নির্মূলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, যে কারণে কমে এসেছে মাদকের চোরাচালান ও ব্যবহার।

আমাদের দেশে নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছে। এটা উদ্বেগের কারণ। নারী আসক্তদের ৯০ ভাগের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। বাদবাকি ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে। মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন নারী। তাদের মধ্যে ছাত্রী, গৃহিণী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী রয়েছেন।

শুধু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে এদেশে মাদক প্রবেশ করে। ভৌগোলিকভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০৪০ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ যুবসমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে মাদকমুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে টার্গেট করে মাদকবিরোধী প্রচারের কাজ করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। আমাদের সংগঠন মানস দীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ এদেশে যুবসমাজের মধ্যে মাদকবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

মাদকাসক্তির পেছনে বিজ্ঞানীরা ও গবেষকরা বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

১. সমবয়সিদের চাপ,
২. হাতের কাছে মাদকদ্রব্য পাওয়া অর্থাৎ মাদকের সহজলভ্যতা,
৩. বেকারত্ব ও কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা,
৪. আর্থসামাজিক অস্থিরতা,
৫. মাদকের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা,
৬. সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়,
৭. পারিবারিক কলহ ,
৮. চিকিৎসা সৃষ্ট মাদকাসক্তি,
৯. কৌতূহল, ধূমপান ইত্যাদি।

মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি স্বভাবতই চিকিৎসা নিতে চায় না। কারণ সে বুঝতেই পারে না যে, তার চিকিৎসার প্রয়োজন। আবার অনেকেই শারীরিক যন্ত্রণার ভয়ে মাদক চিকিৎসায় অনীহা পোষণ করে। এক্ষেত্রে পরিবারের স্ত্রী, বাবা, মা নেশার নেতিবাচক দিক এবং জীবনের সম্ভাবনাময় বিষয়গুলোকে তুলে ধরে প্রতিনিয়ত সহমর্মিতামূলক আচরণের মাধ্যমে তাকে চিকিৎসা নিতে আগ্রহী করে তুলতে পারেন। এমনভাবে আচরণ করতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে, আমরা তাকে ভালোবাসি, তার সুন্দর ও সুস্থ জীবনের জন্য আমরা সহযোগিতা করতে চাই। বেশির ভাগ মাদকাসক্তির Relapse হয় পরিবারের বৈরী এবং সন্দেহমূলক আচরণের কারণে। মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে না পারলে যে-কোনো সময় তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ব্যক্তির নিজ ও তার পরিবারের সার্বিক সহযোগিতাসহ সেবা প্রদানকারী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভালো করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসার সকল পর্যায়ে পরিবারের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

একটি কথা না বললেই নয় যে, মাদকাসক্তির নাটের গুরু হচ্ছে সিগারেট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাদকাসক্তি ও ধূমপানের সাথে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি মারাত্মক বলে উল্লেখ করেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭ হাজার রাসায়নিক পদার্থ আছে, তার মধ্যে ৭০টি ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং একটি উপাদান মাদকের আওতায় পড়ে, সেটি হচ্ছে নিকোটিন। গবেষণায় দেখা যায়, মাদকাসক্তদের

মধ্যে ৯৮ ভাগই ধূমপায়ী। অর্থাৎ ধূমপান দিয়ে তারা তাদের নেশা শুরু করে। পরবর্তীতে তারা গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, হেরোইন ও কোকেনে আসক্ত হয়।

ধূমপান যে মাদক সেবনের প্রবেশ পথ, তা পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১২ বছর তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৮ হাজার মানুষের মধ্যে পরিচালিত জাতীয় একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা ধূমপান করে বা করেছে তাদের হিরোইন সেবনের প্রবণতা ১৬ গুণ বেশি, গাঁজা ও কোকেন সেবনের প্রবণতা ৭ গুণ বেশি (National Household Survey on Drug Abuse- 1994)। গবেষণার তথ্যে দেখা যায়, ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের ধূমপানের পাশাপাশি কোকেনে আসক্ত হওয়ার প্রবণতা ৪৪ গুণ বেশি! যা এ গবেষণার তথ্যের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক।

যুক্তরাজ্যে Addictive Behavior Centre-এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ধূমপায়ীদের মাদক গ্রহণের পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় ২২ গুণ বেশি। গবেষণাটি প্রাথমিক ও হাই স্কুলের ৪০০০ শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত হয়। মূলত কৌতূহলবশত ধূমপানের মাধ্যমে কিশোর-তরুণেরা নেশার জগতে প্রবেশ করে। এ কৌতূহল থেকে একটা অংশ ক্রমশ অন্যান্য মাদকের নেশায় ধাবিত হয়। এটা সকলের জন্য অশনিসংকেত। কারণ ধূমপানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ধাবিত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বন্ধুদের প্ররোচনায় অনেকে মাদক ও ধূমপান সেবন শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে এর একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ২০১৯ সালে *প্রথম আলোর* এক জরিপে অংশ নিয়ে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ তরুণ বলেছেন, তারা ধূমপান করেন। এদের মধ্যে গাঁজা, ইয়াবা সেবন, মদ্যপান ও অন্যান্য মাদক গ্রহণের হার শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে। বন্ধুদের প্ররোচনায় পড়ে সবচেয়ে বেশি মাদক গ্রহণ এবং ধূমপান করেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। ২৯ দশমিক ২ শতাংশ তরুণ বন্ধুদের প্ররোচনায় মাদক নিয়েছেন বলে গবেষণা ফলাফলে উল্লেখ করা হয়। মূলত উঠতি তরুণেরা বন্ধুদের মাধ্যমে বেশি প্ররোচিত হয়েছেন। হতাশায় মাদক নিয়েছেন বা ধূমপান করেছেন ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ তরুণ।

ধূমপান করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। ধূমপায়ী বা তামাক এবং মাদকসেবীরা নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যাসহ জটিল ও কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে বিধায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এবং প্রাণহানির ঝুঁকিতে ছিল এবং আছে। ধূমপায়ীদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যায় ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি– যা কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তদুপরি ধূমপান বা মাদক গ্রহণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পায় বিধায় সহজেই ক্ষতিকর ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এমনকি অকালমৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে এবং প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজ বাড়িতেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তামাকের ক্ষতির শিকার এই বিপুল প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী বর্তমানে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

অসংক্রামক রোগের মহামারি সামনের দিনে আসছে, যার নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং এ মহামারি প্রতিরোধেও ধূমপান ও মাদক গ্রহণ বন্ধ করা জরুরি। ধূমপান শুধু নিজেকে না পরোক্ষভাবে বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান সবাইকে সমানভাবে ক্ষতি করে। সেই সাথে মাদকের নেশা যেমন গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা কিংবা মদ্যপান আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে। করোনাভাইরাস যেমন আমাদের ফুসফুসকে সংক্রমণ করে তেমনি ধূমপান বা ই-সিগারেট কিংবা সিসা সমানভাবে আমাদের ফুসফুসকে সংক্রমণ করে। ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ও ধূমপান বা ই-সিগারেট গাঁজা, হেরোইন, কোকেন ও সিসার মাধ্যমে ফুসফুস সংক্রমিত হয়। সেই কারণে তাদের রোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের ভেন্টিলেটর-এ থাকার ঝুঁকি অন্যান্য অধূমপায়ীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আমরা যেমন মাস্ক ব্যবহার করি, হাত সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধুই এবং সেই সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি, তেমনি অন্যান্য ঝুঁকি থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা এখন জরুরি।

তরুণ জনগোষ্ঠীকে মাদক ও তামাকসহ সকল ক্ষতিকর নেশা থেকে বিরত রাখা অত্যন্ত জরুরি। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা বর্তমানে মাদকাসক্ত আছে (প্রায় ৮০ লক্ষ) তাদেরকে নিরাময়ের মাধ্যমে মাদক থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। মাদক ও তামাকের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিতভাবে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। মাদক ও তামাক নির্মূল স্বরাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। কিশোর-তরুণদের মাদকের নেশা থেকে দূরে রাখতে পারলে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী: বীর মুক্তিযোদ্ধা; একুশে পদকপ্রাপ্ত; শব্দ সৈনিক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস); prof.arupratanchoudhury@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস

অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সূতিকাগার 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'রও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিল উত্থাপন ও পাসের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি একটি অনন্য নজির। কোনো দেশেই আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট সেই পথ ধরেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়েছে, পেয়েছে ভিত্তি, নির্মিত হয়েছে হাজার হাজার চলচ্চিত্র। বঙ্গবন্ধুর সেই উদ্যোগ ও 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠার দিন ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল স্মরণে তাঁরই সুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১২ সালে ঐতিহাসিক সেই তারিখে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পেয়েছে নব অভিধা, নব অঙ্গীকার ও চেতনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবীর কোনো দেশেই জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস নেই।

'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণা ও পালন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে লিখেন:

> দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করতে ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ৩রা এপ্রিল 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আমি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
>
> চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম। মানুষের জীবন, দর্শন, বাস্তবতা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটে চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত ও অপরিমেয় শক্তির কথা উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উত্থাপন করেন। এর মাধ্যমে তিনি রোপণ করেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশের অমিত সম্ভাবনার বীজ। এই অবিস্মরণীয় অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করি।

তিনি আরও লিখেন,

> আমি আশা করি, চলচ্চিত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্র দেশের গণমানুষের জীবন, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠবে। শিল্পমান ও নান্দনিকতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

(প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী, জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৩, *স্মরণিকা*, এফডিসি, ঢাকা)

২

বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় 'রাজনীতির কবি'। সেই সাথে তিনি 'বঙ্গসংস্কৃতির অগ্রদূত' এবং কবিও। তাঁর শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য কেটেছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে। শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত। এই সাংস্কৃতিক বোধ থেকেই চলচ্চিত্রের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তিনি বিদেশি চলচ্চিত্রের বাজার তৎকালীন বাংলাদেশকে চলচ্চিত্র নির্মাণে স্বনির্ভর করার জন্য এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঢাকায় তখন কোনো ফিল্ম স্টুডিও ছিল না। এখানকার সিনেমা হলগুলোতে তখন বিদেশি ও অস্থানীয় ছবি চলত। এফডিসি হওয়ার ফলে ১৯৫৭ সাল থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এখানকার সুবিধা নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো– *আসিয়া*, *জাগো হুয়া সাভেরা*, *আকাশ আর মাটি*, *সূর্যস্নান*, *কখনো আসেনি*, *কাঁচের দেয়াল*, *সুতরাং*, *রূপবান*, *নদী ও নারী*, *আনোয়ারা*, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, *জীবন থেকে নেয়া* প্রভৃতি ছবি প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা পায়।

এসব ছবি দেশের মানুষকে যেমন বিনোদিত করেছে, তেমন দেশের ইতিহাস-জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-জনসচেতনাকে তুলে ধরেছে। বিদেশে পুরস্কারও পেয়েছে কিছু ছবি। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্র পায় নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত হয় নতুন ধারার চলচ্চিত্র। যেমন– *স্টপ জেনোসাইড*, *লিবারেশন ফাইটার্স*, *ওরা ১১ জন*, *ধীরে বহে মেঘনা*, *সংগ্রাম*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *রক্তাক্ত বাংলা*, *আলোর মিছিল*, *আবার তোরা মানুষ হ* ইত্যাদি। অন্যদিকে সাহিত্যভিত্তিক *তিতাস একটি নদীর নাম*, *পালঙ্ক* প্রভৃতি চলচ্চিত্রও তৈরি হয়। ঐ সময় বিদেশে চলচ্চিত্র মেলা ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়, চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য বিদেশে ছবি প্রেরিত হয়, দেশে চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট স্থাপন ও সিনেমা হল এবং স্টুডিও নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ৩রা এপ্রিল ঢাকায় তেজগাঁওয়ে বিএফডিসিতে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০২৪' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

নেওয়া হয়। বলা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন চলচ্চিত্রের আলোর মন্তাজ।

৩

২০১২ সালে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' ঘোষণার পর থেকে দিবসটি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, এফডিসির এমডির বাণী সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, র‍্যালি, এফডিসি সজ্জাকরণ, সেমিনার, চিত্রকর্মীদের সমাবেশ সম্মিলনী, আপ্যায়ন, চলচ্চিত্রের পোস্টার-ব্যানার প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে: (১) জাতীয় চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করা, (২) চলচ্চিত্রের ইতিহাস-ঐতিহ্য-অতীত-বর্তমান সম্পর্কে অবহিত হওয়া, (৩) চলচ্চিত্রের অর্জন ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা, (৪) সরকারি-বেসরকারি ভূমিকা মূল্যায়ন করা, (৫) পাইরেসি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া, (৬) প্রযোজনা, পরিচালনা, পরিবেশনা, প্রদর্শন ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা, (৭) নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, (৮) বিদেশি চলচ্চিত্রের সাথে স্বদেশি চলচ্চিত্রের তুলনামূলক বিচার করা, (৯) চলচ্চিত্র কর্মীদের অবদান স্মরণ করা, (১০) চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা, (১১) চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৪

বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (২০১৩)'। চালু করা হয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বহুতল ভবন। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি' স্থাপনের। চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দুস্থ চলচ্চিত্র শিল্পীদের জন্য ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও অনুদান তহবিলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশেষ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। এফডিসি কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট আলোর পথেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এগিয়ে যাবে গৌরবে সৌরভে, 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস'– এ এই হোক সবার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা।

অনুপম হায়াৎ: লেখক, গবেষক, mostu16@gmail.com

১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ

নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছে আরও ১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা। এ নিয়ে চার দফায় ৫৬০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করল সরকার। ২৪শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে চতুর্থ ধাপে ১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশ করেন।

চতুর্থ দফার শহিদ বুদ্ধিজীবী তালিকায় ৩ জন সাহিত্যিক, একজন বিজ্ঞানী, একজন চিত্রশিল্পী, ৫৪ জন শিক্ষক, ৪ জন আইনজীবী, ১৩ জন চিকিৎসক, ৩ জন প্রকৌশলী, ৮ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, ৯ জন রাজনীতিক, ১৩ জন সমাজসেবী রয়েছেন। এছাড়া সংস্কৃতিসেবী ও চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত এবং শিল্পকলার অন্যান্য শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৯ জন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকায়।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের বহুমাত্রিকতায় বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচন

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। প্রায় পাঁচ দশকের এই সম্পর্ক পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। সৌদি আরব বাংলাদেশি জনশক্তির জন্য সবচেয়ে বড়ো এবং আকর্ষণীয় শ্রমবাজার যেখানে প্রায় ২৮ লাখ বাংলাদেশি বিভিন্ন পেশায় কর্মরত রয়েছেন, যা উভয় দেশের জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ২০২২ সালে প্রায় ৬ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৫৩.৯২ শতাংশ। যে কয়টি দেশ থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসে তার মধ্যে সৌদি আরব অন্যতম। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স

ভারতের নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের সাইডলাইনে সৌদি প্রধানমন্ত্রী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক

এসেছে ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১৭.৭ শতাংশ। এর আগে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ৪.৫৪ বিলিয়ন ডলার, যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরব উভয় দেশই অনেক আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে অভিন্ন মতামত ভাগ করে নেয়। এই ভাগ করা অগ্রাধিকার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুদেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জাতিসংঘ, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামের মধ্যে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করেছে।

দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, কৃষি এবং জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীরতর করার মাধ্যমে দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হয়েছে। সৌদি আরব এখন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাতে বছরের পর বছর ধরে সম্পর্কের গতিশীলতা একমাত্রিক থেকে বহুমাত্রিক সহযোগিতায় বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান মানুষের হৃদয়ে সৌদি আরবের বিশেষ স্থান রয়েছে। প্রতিবছর লক্ষাধিক বাংলাদেশি মুসলিম সৌদি আরবে পবিত্র হজ ও ওমরা পালনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনার জন্য আপামর মানুষের মনে রয়েছে এক বিশেষ আবেগ ও অনুভূতি। এ অনুভূতি কাল থেকে কালান্তরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলেছে।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বর্তমান রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার) দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এছাড়া তাঁর নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কের উন্নয়নে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

সৌদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্রাউন প্রিন্সের বাংলাদেশ সফর

সম্প্রতি বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান জানিয়েছেন, সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ এ বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সরকারি সফরে আসছেন, যা বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হবে। এর মধ্য দিয়ে দুদেশের ব্যাবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় হবে বলে উভয় পক্ষ মনে করে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তবে তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।' এ বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এই সফর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন সৌদি যুবরাজ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজের ঢাকা সফরের পর এটিই হবে কোনো সৌদি যুবরাজের প্রথম বাংলাদেশ সফর।

২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাত বার সৌদি আরব সফর করেছেন। তাঁর এ সকল সফরের মাধ্যমে দুদেশের সম্পর্ক আজ এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশের ভিশন–২০৪১ বাস্তবায়নে সৌদি আরবের সাথে এই সম্পর্ক অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। গতবছর সেপ্টেম্বরে ভারতের নয়াদিল্লিতে জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ এক বৈঠকে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান রিয়াদ ও ঢাকার মধ্যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দেন।

রিয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের বৈঠক

বৈঠকে ক্রাউন প্রিন্স সালমান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। যুবরাজ সালমান পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে আকওয়া পাওয়ারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে সৌদি বিনিয়োগকারীদের চলমান বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেন যে, প্রায় ২৮ লাখ বাংলাদেশি তাদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তার দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ক্রাউন প্রিন্স 'রিয়াদ এক্সপো ২০৩০' আয়োজনের জন্য সৌদি আরবের উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবে বেশকিছু সামাজিক সংস্কার শুরু ও অর্জন এবং সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্যের জন্য সৌদি যুবরাজকে অভিনন্দন জানান।

পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে সৌদি প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

গত ২৩শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলান গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় সৌদি রাষ্ট্রদূত সরকারপ্রধান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সৌদি প্রধানমন্ত্রী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদের একটি অভিনন্দন বার্তা হস্তান্তর করেন। সৌদি রাষ্ট্রদূত জানান, আগামী দিনে হজ ও ওমরা হজের প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সৌদি আরব ও বাংলাদেশ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে সহযোগিতা বাড়াতে পারে। অন্য পেশাজীবীর পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসাকর্মীদের নেওয়ার ব্যাপারেও তার দেশের আগ্রহ আছে বলে রাষ্ট্রদূত জানান। বাংলাদেশের আটটি বিভাগে আটটি মসজিদ ও ইসলামি ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি আরবের ইচ্ছার কথা জানান রাষ্ট্রদূত। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ

বাংলাদেশের ভিশন–২০৪১ বাস্তবায়নে 'ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি'র বিকল্প নেই। তাই উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে 'অর্থনৈতিক কূটনীতি'কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকার কার্যকর কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং ভাবমূর্তি সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতির ভিত্তি হিসেবে পাঁচটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো– বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ; রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ; বিদেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি; প্রযুক্তি হস্তান্তর; বিদেশে বাংলাদেশি অভিবাসীদের মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ।

২০২৩ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থানরত বাংলাদেশি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতিকে শক্তিশালী করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে চলেছে, তাই যেসব দেশে বাংলাদেশ তার ব্যাবসাবাণিজ্য বাড়াতে পারে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।' প্রধানমন্ত্রী কূটনীতিকদের আরও বলেন, 'আপনাদের সব দেশের সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতা করতে হবে। যাতে আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারি, এগিয়ে যেতে পারি এবং ভবিষ্যতে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারি।'

বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ দায়িত্ব গ্রহণের পরই বলেছেন, 'আমি আমার প্রধান ফোকাস হিসেবে অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর জোর দেব।' হাছান মাহ্‌মুদ আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন সরকারের গুরুত্বের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হবে অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং ঢাকা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় গোলার্ধের দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাবে।'

এরই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক কূটনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকার সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সৌদি আরবের ৮ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দুদেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক, ব্যবসায়ীদের সফর, অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিনিয়োগের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। এর মধ্যে পতেঙ্গা টার্মিনাল পরিচালনার চুক্তি, সৌদি আকওয়া পাওয়ার (ACWA POWER)-এর বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, সৌদিতে ডিএপি ও ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ উদ্যোগ রয়েছে।

গত ৬ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পিপিপি-জিটুজি ভিত্তিতে নবনির্মিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (PCT) পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (RSGTI) -এর মধ্যে কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এ চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আশার বাতিঘর।' তিনি বলেন, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ এই আধুনিক টার্মিনালটি আমাদের বন্দরের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে এবং নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য সহজতর করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথও সুগম করবে।'

রিয়াদে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ প্রোডাক্টস এক্সিবিশন' উদ্বোধন করেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবকে বন্ধুপ্রতিম দেশ এবং বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'সৌদি আরবের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে। আমরা সব সময়ই সৌদি আরবকে আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি পেয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সফররত সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী খালিদ আল-ফালিহর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। RSGTI আগামী ২২ বছর পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সৌদি সরকার, বিশেষ করে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, ক্রাউন প্রিন্স প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সালমানের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের আস্থা ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সৌদি প্রতিষ্ঠান আকওয়া পাওয়ার (ACWA POWER) এরই মধ্যে ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ৩৫০ কোটি ডলার বা সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। পায়রা বন্দর এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০২২ সালে আকওয়া পাওয়ার এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে সৌদি আরবের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আকওয়া পাওয়ার এর আগে ১০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের পায়রা সমুদ্রবন্দরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরিতে সৌদি আরব আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী, বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সৌদি মন্ত্রী ও চেম্বারের সাথে বৈঠক করে ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয় ত্বরান্বিত করেছেন।

সালমান এফ রহমান আরও জানান, ফুড সিকিউরিটির বিষয়ে সৌদি আরব বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। মূলত তারা বাংলাদেশে সবজি, মাছ বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে, তারা সেটি তাদের দেশে নিয়ে যাবে।

সৌদি আরবে বাংলাদেশের সাথে যৌথ মালিকানায় একটি ডাই এমোনিয়াম ফসফেট সার কারখানা স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি চলছে এবং একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা চলছে। আশা করা যায় অচিরেই সৌদি আরবে এ সকল বিনিয়োগ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে ফসফেট ও ইউরিয়া সারের জোগান নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সৌদি আরবে বাংলাদেশের মালিকানাধীন একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্থাপনের বিষয় চূড়ান্ত অবস্থায় রয়েছে। সৌদি আরবের বিভিন্ন মেলায় বাংলাদেশের খাদ্যপণ্য, ঔষধ, পোশাকশিল্প স্থানীয়দের কাছে তুলে ধরার বিষয়টি চলমান রয়েছে।

দুদেশের মন্ত্রী ও ব্যবসায়ীদের সফর ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা

২০২৩ সালের ১১ই মার্চে সৌদি বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাবি ঢাকায় এফবিসিসিআই আয়োজিত বিজনেস সামিটে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ৫৬ জন সৌদি ব্যবসায়ীদের এক বিশাল দল নিয়ে সামিটে যোগ দেন। তিনি এ সফরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। একইসাথে তিনি বাংলাদেশের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সাথে বৈঠক করেন ও বাণিজ্য, বিনিয়োগ বিষয়ে চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এছাড়া তার এ সফরের সময় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ও সৌদি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফএসসিসি-এর সাথে যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠিত হয়। যার আলোকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই ও ডিসিসিআই সৌদি আরব সফর করেন ও সৌদি আরবের বিভিন্ন চেম্বারে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেন। এটি দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি ও ব্যাবসার সুযোগ তৈরি করেছে। খাবার ও বেভারেজ, পোশাক, পাট ও চামড়াজাত পণ্যসহ সাতটি সম্ভাবনাময় পণ্যের ৩৫ বিলিয়ন ডলারের সৌদি বাজার ধরতে চান বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা।

রিয়াদে ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও পানীয় পণ্যের মেলা 'ফুডেক্স সৌদি'তে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানির অংশগ্রহণ

গতবছর অক্টোবরে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে ৬১টি বাংলাদেশি কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বেসরকারি খাতের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সৌদি সফর করেন। এ সময় দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের এ ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশের বড়ো বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে আইটি, কৃষি পণ্য, অবকাঠামো, নির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, গার্মেন্টস পণ্য, সিরামিক পণ্য, পর্যটন ও সেবা খাতের প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং সবাই সৌদি আরবের সাথে ব্যাবসা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সফরে সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের উল্লেখ করে স্মার্ট ফার্মিং, আইটি, ফিনটেক, লজিস্টিকস এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিরা মদিনা চেম্বারের সাথেও বৈঠক করে ব্যবসায়িক আলোচনা করেন।

এছাড়া ২০২৩ সালের নভেম্বরে এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সৌদি সফর করেন। এ সময় তিনি ফেডারেশন অব সৌদি চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ সালেহ আল ফরিদীর সাথে বৈঠক করেন। এফবিসিসিআই সভাপতি সরকারের বিনিয়োগ সুবিধা উল্লেখ করে সৌদি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সৌদি ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশে বিশেষ ইকোনমিক জোন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

এফবিসিসিআই এবং ফেডারেশন অব সৌদি চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের মধ্যে বিজনেস কাউন্সিল এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের সহযোগিতায় বিটুবি ম্যাচ মেকিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এফবিসিসিআই-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত বিজনেস সামিটে দুদেশের মধ্যে যে যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠিত হয় তারই ধারাবাহিকতায় রিয়াদে এসময় দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথম বিজনেস কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে জ্বালানি, আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, খাদ্যপণ্য, লজিস্টিকস, পোশাক শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে পারস্পরিক ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়। এফবিসিসিআই-এর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল জেদ্দা চেম্বারের সাথেও বৈঠক করেন।

২০২১ সালের ২৮শে নভেম্বরে ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনে সৌদি আরবের পরিবহণ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার সালেহ বিন নাসের আল জাসের ১৭ সদস্যের সৌদি প্রতিনিধি দল নিয়ে যোগ দেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দল বেজার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর পরিদর্শন করেন ও সৌদি আরবের বিনিয়োগের জন্য ৩০০ একর বিশেষ জায়গা বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে দূতাবাসের উদ্যোগ

ইতঃপূর্বে সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত গোলাম মসীহ বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সৌদি শ্রম বাজার উন্মুক্ত করতে সফল হয়েছেন। এছাড়া শ্রমবাজার বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়েছেন। সৌদি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ আগ্রহ তৈরিতে তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন।

সৌদি আরবে বর্তমানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী দায়িত্ব গ্রহণের পর কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে সকল প্রদেশের গভর্নরদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া রয়েল কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবহণ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, কৃষিসহ সকল মন্ত্রীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিষয় জোরদারের জন্য আলোচনা করেন। এ সময় দুদেশের সাথে ব্যাবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সৌদিতে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের সুবিধাদি নিশ্চিত করার বিষয়ে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

সম্প্রতি রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীর মধ্যস্থতায় সৌদি আরবে নিহত দুই বাংলাদেশি পরিবারের অনুকূলে ক্ষতিপূরণের প্রায় ৩০ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুবরণ করা ৬৫ জন বাংলাদেশি কর্মীর বকেয়া পাওনা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও ব্লাডমানি হিসেবে আদায়কৃত ২.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঢাকাস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের 'Death Compensation Fund'-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

রিয়াদ দূতাবাসের প্রচেষ্টায় উপসাগরীয় দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য জিসিসি-গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল-এর সাথে বাংলাদেশের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ সকল দেশে ৫০ লাখেরও অধিক বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছে। একইসাথে এসব দেশের সাথে ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এ সমঝোতা স্মারক সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। গত ১৮ই নভেম্বর ২০২২ সালে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৬ই মার্চ ২০২২ তারিখে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রথমবারের মতো পলিটিক্যাল কনসালটেশন বৈঠক করেন, যা দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করেছে।

বাংলাদেশ গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সৌদি নেতৃত্বাধীন ডিজিটাল কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (DCO)-এর সদস্যপদ লাভ করেছে। যার ফলে দুদেশের মধ্যে ডিজিটাল তথ্য লেনদেন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সৌদি আরব ডিজিটালাইজেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

প্রবাসীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম

সৌদি আরবে প্রবাসীদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে স্কিল ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, যার ফলে ২৯টি কারিগরি বিষয়ে প্রবাসীরা সৌদি আরব আসার পূর্বেই বাংলাদেশ থেকে দক্ষতার সনদ নিয়ে আসতে পারবেন, এছাড়া এ সনদ থাকার ফলে চাকরির নিশ্চয়তাও রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সৌদি আরবে ভালো চাকরি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য ২০২১ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি থেকে শুরু করে স্নাতক পর্যন্ত প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। যার আওতায় সৌদি আরব বসেই প্রবাসীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এ সকল শিক্ষা কার্যক্রম প্রবাসীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেখানে ভালো চাকরি পেতে সহায়তা করবে।

দুদেশের মধ্যে অন্যান্য সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা (ওআইসি)-তে বিভিন্ন সভায় রোহিঙ্গা বিষয়, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের হামলার নিন্দা, সুদানের গৃহযুদ্ধের নিন্দা, আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পবিত্র *আল কোরান* পুড়ানো বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সব সময়ই তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সবসময় শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে ওআইসিতে উচ্চকিত রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরে সৌদি আরবের মিডিয়া, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও ক্রিকেটের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো রিয়াদ সিজনে বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপনে অংশ নেওয়া হয়েছে– যা ২০২৩ সালেও অব্যাহত ছিল। সৌদি আরবের ক্রিকেট এসোসিয়েশন-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তৈরি ও সৌদি ক্রিকেটকে সহায়তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান প্রায় ছয়শত শিক্ষার্থী সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।

সৌদিতে রিয়াদ এক্সপো ও বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন

২০৩০ সালে রিয়াদ এক্সপো ও ২০৩৪ সালে সৌদি আরবে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এসব আয়োজনে বাংলাদেশ সৌদি আরবকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। আগামী দিনে এ সকল আয়োজনকে ঘিরে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হবে। ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপকে ঘিরে সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হলে বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্সের নেতৃত্বে ভিশন–২০৩০ বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে কাজ এগিয়ে চলছে। সৌদির তাবুকে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক নিওম সিটি, কাজ চলেছে রেড সি প্রজেক্ট, কিদিয়া, ট্রজেনা, আমালা, আল উলা, দিরিয়া ও নিউ মোরাব্বা মেগা প্রজেক্টসহ অসংখ্য প্রকল্পের। এসব প্রজেক্টে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন হবে দক্ষ, আধা-দক্ষ শ্রমিকদের যা বাংলাদেশের জন্য সুযোগ তৈরি করছে। এছাড়া সৌদি পর্যটন খাতের বিকাশের সাথে সাথে সেবা খাতেও প্রয়োজন হবে দক্ষ শ্রমিকদের। বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের পর্যটনের গভীর সম্পর্ক তৈরি হলে আমাদের পর্যটন খাতে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হবে।

২০২৩ সালে ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট' শীর্ষক একটি রোড শো'র অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে, যা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষেরও স্বপ্ন, আর তা হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট জাতিতে পরিণত করা।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের স্মার্ট দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ও দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সৌদি আরবের সাথে বহুমাত্রিক এ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি ও ব্যাবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুদেশের জনগণের মধ্যে এক অনন্য সম্পর্ক তৈরি হবে। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে সৌদি আরব ইতোমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম: পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

পরিবর্তনশীল আগামীর দক্ষতায় বই

আফরোজা নাইচ রিমা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা এবং বই একে অন্যের পরিপূরক। আগামীর পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বই ও দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, দর্শনের অবতারণা হবে এবং ইতোমধ্যে সেটি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করানোর ওপর একদিকে জোর দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনশীল দুয়ারে পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত এবং পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান ডিজিটালনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় ই-লার্নিং ও অনলাইন শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে ট্রেড কোর্স কিংবা প্রফেশনাল কোর্স বা বিকল্প কোর্সের ব্যবস্থা নিয়ে। একদিকে পরিকল্পনায় থাকছে সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়, অন্যদিকে শুধু প্রযুক্তির ওপরেই নয়, ই-বুক কিংবা শিল্প-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে বই-ই একমাত্র বিকল্প এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান। কেননা মানবসভ্যতা সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যা কিছু ঘটেছে সবকিছুই লিখিত আকারে রয়েছে বইয়ে। উদাহরণস্বরূপ আইন এবং ধর্মগ্রন্থের কথা উল্লেখযোগ্য।

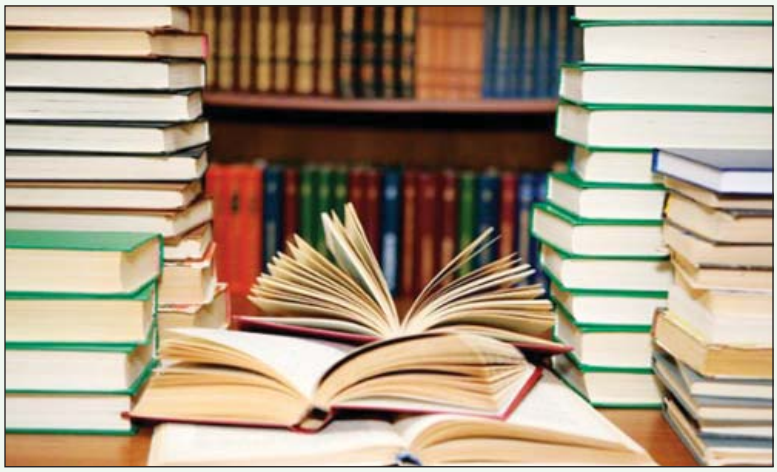

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষের চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখের চাহিদা বা প্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটবে ভার্চুয়াল জগতে, প্রযুক্তির মাধ্যমে আর এই ভার্চুয়াল বাস্তবায়নে বই উৎকর্ষ সাধনের এক এবং অন্যতম অনুষঙ্গ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সময়োপযোগিতার সাথে সাথে বই পড়া যেন বর্তমান প্রজন্মের জন্য খুবই অনুধাবনযোগ্য।

মানুষ ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত হওয়ায় বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এজন্য বর্তমান সরকার ২০২৪-এর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নিয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ। বই উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনে ১০ম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণে বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের রোল মডেল। বই বিতরণের ফলে ভর্তির হার বেড়েছে এবং ঝরে পড়া কমে আসছে। ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও কারিগরি স্তরের শিক্ষার্থীর মাঝে ২৬০ কোটির বেশি কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্রেইল বই বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে।

একইসাথে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভাষা, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরি গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও গণিতের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদানের অঙ্গীকারও করা হয়েছে।

নির্বাচনি ইশতেহারে আরও উল্লেখ করা হয়– দেশের সকল লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার, খুলনায় ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স, শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র, উকিল মুন্সী স্মৃতিকেন্দ্র, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি এবং ৮টি জেলায় নতুন শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হবে। দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩২০০টি নির্ধারিত এলাকায় জনসাধারণের দোরগোড়ায় লাইব্রেরি সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ দেশের ভেতরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। এছাড়াও ফ্রাঙ্কফুট ও কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ এবং আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বইমেলার আয়োজন হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে। আর জ্ঞানই একমাত্র সফলতার চাবিকাঠি। কারণ জ্ঞান সফলতার পথকে প্রশস্ত করে। বইয়ের মাধ্যমেই নাগরিক হবে স্মার্ট এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সবাই এখন ব্যস্ত স্মার্ট ফোন নিয়ে। অথচ যদি নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে কাজের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

একইসাথে শব্দ ভাণ্ডার বাড়াতে, স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে বই পাঠকের মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধ্যয়ন চিত্তভ্রংশ (ডিমেন্সিয়া) ও আলজেহিমা নামের এই রোগ দুটিকে হ্রাস, এমনকি প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। মানসিক চাপ কমাতে বইয়ের মাধ্যমে গল্পের বিভিন্ন প্লট পাঠককে চিন্তার ভিন্ন জগতে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পাঠক সহজেই দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে সক্ষম হবে। বই পড়ার সময় প্রত্যেকটি মানুষের একদিকে কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মানুষের মনে নতুন

নতুন ধারণা সৃষ্টি করে। যার কারণে পাঠকের মনে কৌতূহল বাড়ে। এককথায়, নিজের কল্পনাশক্তি ও কৌতূহল বৃদ্ধি করার জন্য বই পড়া অপরিহার্য।

বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, একাকিত্ব দূর করার জন্য বই সব থেকে ভালো উপায়। সম্প্রতি মোবাইল ফোনকে সবাই সঙ্গী করে নিয়েছে। কিন্তু যদি ব্যক্তি মোবাইলের মধ্যে বই পড়া শুরু করেন, তাহলে তার জীবনের একঘেয়েমি চলে যাবে এবং ব্যক্তি একজন ভালো বন্ধু খুঁজে পাবে। নিজের মনকে শান্ত করতে এবং মনের মধ্যে নতুন শক্তি জোগাতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। জীবনে ভিন্ন কিছু বা বড়ো কিছু করতে চাইলে একমাত্র বই-ই সেই অনুপ্রেরণা দিতে পারে। যে-কোনো কিছু ইতিবাচক চিন্তা করা এবং নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য বই অত্যন্ত উপকারী।

লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে যখন বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই পড়া হয়, তখন ভাষাতত্ত্বের বিকাশ হয়। সে কারণে উন্নত শব্দ এবং সুন্দর করে ভাষা প্রয়োগও সহজে সম্ভব হয়, যা বাস্তব জীবনে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মস্থলে বা কোথাও বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপস্থাপনকে অনেক চৌকষ করে তুলতে সক্ষম করে। এতে করে উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্র ফলপ্রসূ হবে। ফরাসি দার্শনিক রনে দেকার্ত লিখেছেন, 'ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলা।'

বই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির আধার। প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানচর্চা করতে বইয়ের বিকল্প নেই। ইরানের কবি ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত উক্তিটি বইয়ের গুরুত্ব বোঝার জন্য অসাধারণ। তিনি বলেছেন, 'বই অনন্ত যৌবনা, যদি তেমন বই হয়।' সুতরাং বই হোক প্রত্যেক মানুষের উত্তম বন্ধু। মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের মতে, 'বইয়ের মতো এত বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই।' আলো যেমন অন্ধকার দূর করে সব কিছু স্পষ্ট করে তোলে, তেমনি বই মানুষের জ্ঞানের আলো এনে সব অন্ধকারকে দূর করে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করে। বই অতীত থেকে ভবিষ্যৎ, নিকট থেকে দূরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে জ্ঞানের আলোকে পৌঁছে দিতে পারে। তাই দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে জ্ঞানের আলোকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে একমাত্র বই। মার্ক টোয়েনের মতে, 'ভালো বন্ধু, ভালো বই এবং একটি শান্ত বিবেক: এটি আদর্শ জীবন।'

এককথায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, তথ্যবিপ্লব, তথ্য মুক্তি, প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ই-বুক, অডিও বুক, পিডিএফ, অন-লাইন রিডিং প্ল্যাটফরম, বিভিন্ন অ্যাপ হতে পারে বইয়ের নতুন প্ল্যাটফরম। অমর একুশে বইমেলা ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '...এখন প্রকাশকদের শুধু কাগুজে প্রকাশক হলে চলবে না, ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে। তাহলে আমরা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারব। বিদেশেও পৌঁছাতে পারব। লেখার পাশাপাশি অডিও থাকবে, এমনটাই করা উচিত।'

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রয়েছে বিভিন্ন ধারা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণা অনুবাদ, চারু ও কারুশিল্প, স্থাপত্য, আবৃত্তি, সংগীত, চলচ্চিত্র, যাত্রা, নাটক, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সৃজনশীল প্রকাশনাসহ শিল্পের সব শাখার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্রে বই হোক অন্যতম অবলম্বন। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রত্যেক নাগরিক বই কিনব, পড়ব, বুঝব, লিখব এবং অপরকে বই পড়তে উৎসাহিত করব। পরিবর্তনশীল আগামীর দক্ষতায় বই হয়ে উঠুক নিত্যসঙ্গী।

আফরোজা নাইচ রিমা: উপ-প্রকল্প পরিচালক, তথ্য অধিদফতর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

এভিয়েশন ও ট্যুরিজম খাতে অবদানের জন্য সম্মাননা পেলেন ১০ নারী

এভিয়েশন ও ট্যুরিজম খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'এটিজেএফবি এভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন এই খাতের ১০ নারীকর্মী। ১৩ই মার্চ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের সাংবাদিকদের সংগঠন এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম বাংলাদেশ (এটিজেএফবি)-এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী বলেন, নারীদের যখনই সুযোগ দেওয়া হয়েছে তখনই তারা ভালো করেছেন এবং এগিয়ে গিয়েছেন। নারীরা প্রমাণ করেছেন তারা কারো থেকে কোনো অংশে কম নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। আজকের অ্যাওয়ার্ডটিও একটি ইউনিক অ্যাওয়ার্ড। এই আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন সরকার তাই করবে।

অনুষ্ঠানে এভিয়েশন উদ্যোক্তা ক্যাটেগরিতে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিলরুবা পারভীন, ট্যুরিজম উদ্যোক্তা ক্যাটেগরিতে বাটারফ্লাই পার্কের চেয়ারম্যান মনোয়ারা হাকিম আলী, লিডারশিপ ক্যাটেগরিতে অ্যাটাব-এর সাধারণ সম্পাদক আফসিয়া জান্নাত সালেহা, সাংবাদিক ক্যাটেগরিতে গ্রিন টিভির নির্বাহী সম্পাদক নাদিরা কিরণ, এভিয়েশন ট্রেইনার ক্যাটেগরিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টারের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) রাশেদা কবির চৌধুরী, পাইলট ক্যাটেগরিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের তাসমিন দোজা, ওটিএ উদ্যোক্তা ক্যাটেগরিতে শেয়ার ট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সাদিয়া হক, অ্যারোনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ক্যাটেগরিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অ্যারোনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সামিয়া হালিম কবির, কেবিন ক্রু ক্যাটেগরিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রু ফারহানা ইসলাম নুসরাত, ক্যালিনারি ট্যুরিজম ক্যাটেগরিতে ন্যাশনাল হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ট্রেইনার জাহেদা বেগম পুরস্কার পান।

প্রতিবেদন: প্রণব দাশ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

কে সি বি তপু

বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বাধীনতা অর্জন। আর এ অর্জনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞায় কূটনৈতিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ হৃদয়নিংড়ানো

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman
26 March, 1971"

Source: THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH [Printed with latest amendment, April, 2016], Sixth Schedule [Article150(2)], Page-177

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কর্তৃক প্রদত্ত
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১"

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬], ষষ্ঠ তফসিল [১৫০(২) অনুচ্ছেদ], পৃষ্ঠা-১৫২

স্বতোৎসারিত ৭ই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি জাতিকে এক পতাকাতলে সমবেত করে। এ ভাষণে বাঙালি জাতি দিক নির্দেশনা পায়। তাঁর ভাষণে দেন স্বাধীনতার ডাক। এ ভাষণে ঘোষিত 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে', 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইন্‌শাল্লাহ', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– ইত্যাদি তাঁর মর্মস্পর্শী তেজস্বী আহ্বান নিরস্ত্র বাঙালিকে বীর বাঙালিতে উন্নীত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালির শিরায় শিরায় আবেগ আর উত্তেজনার ঢেউ তোলে এবং মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ভয়াবহ গণহত্যার পরিপ্রক্ষিতে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন, 'আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন' এবং 'পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও'। জাতির পিতার অনুপস্থিতিতে তাঁর পথনকশা অনুসরণে তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সহচরদের উদ্যোগে ১০ই এপ্রিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এ ঘোষণা দেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে বাঙালির দুঃসময়ের কাণ্ডারি জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি আন্দোলন, গণ-আন্দোলন, সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জাতীয় চার নেতাও বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের দাবি আদায়ে অবিচল থাকায় তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এতে তিনি দমে যাননি বরং জেল-জুলুম এমনকি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঙালিদের একতাবদ্ধ করতে অদম্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নানারকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু নিজেকে প্রস্তুত করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবির আদায়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিয়ে একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির আপাত লক্ষ্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন অর্জন কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য মুক্তি অর্জন। তাজউদ্দীন আহমদ ও ছাত্রলীগের নেতাদের দৃঢ় সমর্থনের ফলে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি রূপে গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা সারা বাংলায় এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে প্রচার করেন।

ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কর্মসূচি স্তব্ধ করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হলো দেশরক্ষা আইনে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রধান নেতাদেরও আটক করা হলো। শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হলো সর্বাত্মক ধর্মঘট। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনা হলো দেশদ্রোহের অভিযোগ। দায়ের করা হলো রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা যা সাধারণভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মামলার বিচার শুরু হলে দানা বাঁধতে শুরু করে আইয়ুববিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়ার সাথে একটু কৌশল করে ছয় দফার মিশেলে এগারো দফায় রচিত হলো ছাত্রসমাজের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন। নভেম্বর মাসে সে আন্দোলন

*১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখ-তা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম তফসিল।

বেশ বেগবান হয়ে উঠল। আর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে আন্দোলন পরিণত হলো অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানে; অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দির মুক্তি দিতে বাধ্য হলো সরকার। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গণসংবর্ধনায় সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় ভূষিত করলেন। তিনি মুজিব ভাই থেকে হলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিই ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের ভিত্তি। বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় কৃতিত্ব এখানেই যে, ছয় দফার সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর গ্রেপ্তারের পূর্বে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীদের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নৃশংস গণহত্যা চালায়, এরপরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে 'স্বাধীন' ঘোষণা করে দেশবাসীর উদ্দেশে একটি তারবার্তা পাঠান। ওয়্যারলেস বার্তায় প্রচার করা হয় সেই স্বাধীনতার ঘোষণা। এরপর তা কপি করে বিলি করা হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* তৃতীয় খণ্ডে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর, অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে এই ঘোষণা দেন তিনি, যা তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও ২৭শে মার্চ বেশ কয়েকজন শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিতপরে পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায়। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের বিষয়টি মূলত এই জাতীয় চার নেতার ওপর বর্তায়। তবে প্রখর নেতৃত্বের অধিকারী ও মেধাবী হওয়ায় এবং কৌশল নির্ধারণে পরিপক্বতার কারণে বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদের ওপর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ সরকার গঠনের মতো গুরুদায়িত্ব চলে আসে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের গভীর সম্পর্কের কারণে সরকার গঠন, পরিচালনা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনার ইঙ্গিত তিনি পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

২৫শে মার্চের কাল রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত বর্বরোচিত গণহত্যা বিশ্ববাসীকে জানাতে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সরকার গঠনের কথা মাথায় রেখে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ভারত গমন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অংশে জনগণের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রাক্কালে ঊর্ধ্বতন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেন। ৩০শে মার্চের মধ্যেই তাদের অনেকে কলকাতায় সমবেত হন।

তাজউদ্দীন আহমদ ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যারাতে। এ সাক্ষাৎকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাজউদ্দীন আহমদ সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় দিন ৫ই এপ্রিল আবারও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের আলোচনা হয়। এসব আলাচনায় তাঁর প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক আচরণ এবং দূরদর্শিতা ইন্দিরা গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লিতে গিয়ে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সরকার গঠনের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের যে সকল নির্বাচিত সদস্য ১০ই এপ্রিল মিলিত হন তাঁরা একটি প্রবাসী আইন পরিষদ গঠন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলায় (পরবর্তী নাম মুজিবনগর) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপরিষদ সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে নবগঠিত আইন পরিষদ বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়। ঘোষণাপত্রে ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাবলে মুজিবনগর সরকার বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং এ ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে চেইন অব কমান্ড স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এবং যার ওপর ভিত্তি করে ঐদিনই মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের এক বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করার মাধ্যমে একটি বৈধ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতঃপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন এবং বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ পূর্বনির্ধারিত স্থান মেহেরপুর মহকুমার বৃক্ষরাজি শোভিত ছায়াসুনিবিড় বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিসভার শপথ পাঠ করানোর পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন এম মনসুর আলী (অর্থমন্ত্রী), এএইচএম কামারুজ্জামানসহ (স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী) মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য। মুক্তিযুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে শপথ গ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিবনগর।

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একই দিনে আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ নামে একটি আদেশ জারি করেন। স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল আইন চালু ছিল, তা রক্ষার্থে এটা করা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরেও ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের সংবিধানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় এবং বাংলাদেশের একটি ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধান হিসেবে ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় এটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এ উল্লেখ করা হয়।

২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারের সময় গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে '১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ' এবং '১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম' এবং '১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলো হলো 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়ের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে' এবং এগুলো 'সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য' গণ্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে ২০১১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫ম তফসিলের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে, ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে এবং ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের সপ্তম তফসিলের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সংযোজন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক 'আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১৯৭১'-টি এ সংবিধানের পরিশিষ্ট-১ হিসেবে শুধু ইংরেজি ভাষায় সংযোজন করা হয়। (বাংলাপিডিয়া)

বহুল আলোচিত পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ হত্যা মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৮ই জানুয়ারি ২০২০ কয়েক দফা পর্যবেক্ষণসহ ২৯ হাজার ৫৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে–

> ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানসহ অন্য জাতীয় নেতাদের মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে

গ্রহণের মধ্য দিয়ে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

নবগঠিত প্রবাসী সরকার জেনারেল এমএজি ওসমানীকে রণাঙ্গনের প্রধান (সেনাপ্রধান) নিযুক্ত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মুজিবনগর সরকারকে এসপি মাহবুবের নেতৃত্বে ইপিআরের ১২ বাঙালি সৈনিকসহ আনসার সদস্যরা প্রথম গার্ড অব অনার প্রদান করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান করে নেন।

রায়ে বলা হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও এর ভিত্তি রচিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সময়ে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল একটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে এবং ওই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এবং গোড়া থেকেই এ সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ...

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির উদ্দেশে দেওয়া দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন ইপিআরের জুনিয়র অফিসার ও জওয়ানরাই ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ...

(ওয়াকিল আহমেদ হিরন, 'বিডিআর হত্যা মামলার রায়ে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ: বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক', *দৈনিক সমকাল*, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০)

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বের বিষয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের নিম্নলিখিত ঘোষণাসমূহ প্রণিধানযোগ্য–

> ... যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, ...
>
> যেহেতু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি

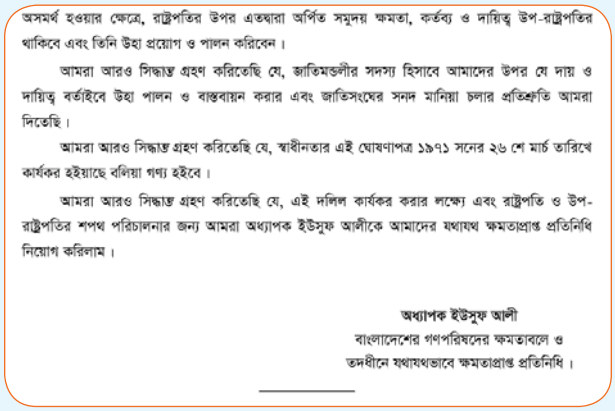

অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

> গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং ...
>
> সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং
>
> এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না-হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন,
>
> এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ...
>
> (পৃ. ১৫৩-১৫৪, সপ্তম তফসিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, এপ্রিল, ২০১৬)

বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘ কারাবাসের পরও বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় মনোবল তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের গৌরবমণ্ডিত অর্জন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই মুক্তিসংগ্রামের ডাক দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার অবর্তমানে তাঁরই নির্দেশনা অনুসরণে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাঁরই বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। জাতীয় চার নেতা ছিলেন যেমন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত, তেমনি ছিলেন প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অধিকারী। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে যে মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ছিল অভূতপূর্ব। তাঁদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণায়ও ছিল তাঁদের কৃতিত্ব। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। তাঁরা ইতিহাসে উজ্জ্বল আদর্শিক নক্ষত্র। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কে সি বি তপু: প্রাবন্ধিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

অটিজম বিষয়ে সচেতন হোন

ইসমত আরা পারভীন

অটিজম হচ্ছে শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের এক প্রকার প্রতিবন্ধকতা, যা সাধারণত শিশুর তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে বেশ সমস্যা লক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা অটিজমকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চারগুণ বেশি। সাধারণত শিশুর বয়স ৩ বছর হবার আগেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সাধারণ লক্ষণসমূহ হলো– শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা, এক বছর বয়সের মধ্যে 'দাদা', 'বাবা', 'বুবু' উচ্চারণ করতে না পারা, দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা না বলা, স্বাভাবিক আচরণ করতে না পারা, চোখে চোখ রেখে না তাকানো, আনন্দের বিষয়ে আনন্দ না পাওয়া, পছন্দের বিষয় কারো সাথে ভাগ করে না দেওয়া, নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেওয়া, পরিবেশ অনুযায়ী মুখভঙ্গি পরিবর্তন না করা, একই কাজ বার বার করা (হাত নাড়ানো, তালি দেওয়া) ইত্যাদি। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকতে পারে। যেমন– খিঁচুনি (মৃগী), অতিচঞ্চলতা (হাইপার অ্যাক্টিভিটি), স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, হাতের কাজ করতে জটিলতা, হজমের সমস্যা, দাঁতের সমস্যা প্রভৃতি।

২রা এপ্রিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। দিবসটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৬২/১৯৯ ধারা অনুযায়ী মনোনয়ন লাভ করে। 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' প্রস্তাবটি ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়েছিল। সেটি একই বছর ১৮ই ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছিল। এটি প্রস্তাব করেছিলেন জাতিসংঘে কাতারের প্রতিনিধিবৃন্দ, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্সেস শিখা মোজাহ বিনতে নাসের আল মিসনদ এবং তার স্বামী কাতার রাজ্যের আমির শেখ হামদ বিন খলিফা আল থানি। সকল সদস্যরাষ্ট্র এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে। প্রস্তাবটি জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনে বিনা ভোটে পাস ও গৃহীত হয়েছিল। বিশ্ব অটিজম দিবস স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতিসংঘের সাতটি দিবসের মধ্যে অন্যতম।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, "বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ বছরও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক '১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিস্যাবিলিটি (এনডিডি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং অটিজম নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা' যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অংশ। সরকার প্রতিবন্ধী ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত আন্তরিক। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার ইতোমধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩', 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩', 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা প্রদানের পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং ও থেরাপি সেবা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইতোমধ্যে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণের জীবনমান উন্নত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, "বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, অটিজম বিষয়ক গবেষক, শিক্ষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'সচেতনতা- স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার অটিজম ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার। বিগত ১৫ বছরে আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে

ব্যাপক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি। এর মধ্যে রয়েছে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯। আমাদের সরকার এসকল আইনের সফল বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'কাউকে পেছনে রেখে উন্নয়ন নয়'– এ নীতির আলোকে আমরা সমাজের সকলের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।"

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) দেশের ১৪টি স্থানে প্রকল্প হিসেবে ১৪টি অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে ট্রাস্ট যৌথভাবে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' বাস্তবায়ন করছে।

সরকার এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Strategy and Action Plan: 2016-2030)' প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। একইসাথে শিক্ষকদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অমৌখিক যোগাযোগের জন্য 'বলতে চাই' এবং অটিজম বিষয়ক প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা শনাক্তকরণের জন্য 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক দুটি অ্যাপস তৈরি করেছে ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর তনয়া সায়মা ওয়াজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অটিজম মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষ, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিতদের তত্ত্বাবধানে, বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা, প্রত্যেক শিশুর চাহিদা পূরণ, বিকলাঙ্গ শিশুদের আর্থিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্কুল সাইকোলজিস্ট, ব্যারি ইউনিভার্সিটির স্কুল সাইকোলজি বিভাগের ক্লিনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্যানেলের সদস্য, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-এর 'ভালনারেবিলিটি' বিষয়ক শুভেচ্ছা দূত, অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস বিষয়ক ক্লাইমেট ভালনারেবল জাতীয় অ্যাডভাইজারি কমিটি ও সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইতোমধ্যে দেশে অটিজম সংক্রান্ত বেশকিছু চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যেমন– ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (IPNA) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু রোগ বা মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ, নিকটস্থ জেলা সদর হাসপাতাল বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রভৃতি। সায়মা ওয়াজেদ সরকারের সমর্থনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (সিএনএসি) নামে একটি কেন্দ্র চালু করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে সিএনএসি (CNAC)-এর উদ্বোধন করেন। অটিজমে আক্রান্ত বাক্-প্রতিবন্ধীদের যোগাযোগের জন্য একটি ডিজিটাল সমাধান 'বলতে চাই' অ্যাপ চালু করা হয়। এতে রয়েছে উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি যা শিশুর বিকাশ পরিলক্ষণ এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অ্যাপটি বর্তমানে গুগল প্লে-স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। প্লে-স্টোরের লিংক (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aims.baltechai)।

বিশ্বে অসংখ্য অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে থেকে তৈরি হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের শিশুরা সে পথেই হাঁটছে। অটিজমের শিকার একজন মানুষ আর দশজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে কম নয়। সহমর্মিতায় ভরা পরিবেশ, শেখার সুযোগ আর তাদের প্রতি সমতাপূর্ণ দৃষ্টি– এতটুকু দিতে পারলে এ মানুষগুলো সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসমত আরা পারভীন : প্রাবন্ধিক

কৃষি তথ্য ও পরামর্শ প্রাপ্তিতে জনপ্রিয় হচ্ছে হটলাইন নম্বর ১৬১২৩

মোবাইলে কৃষি বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রাপ্তিতে দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে কৃষি কল সেন্টারের হটলাইন নম্বর ১৬১২৩। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত যে কেউ এ নম্বরে কল করে কৃষি বিষয়ক যে-কোনো সমস্যার বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। যে-কোনো অপারেটরের মোবাইল ফোন থেকে এ নম্বরে কল করা যাবে। প্রতি মিনিটে ব্যয় হবে ২৫ পয়সা। কৃষি কল সেন্টারে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এ তিন ক্যাটাগরিতে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষিবিষয়ক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১২ সালের জুন মাসে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালনায় 'কৃষি কল সেন্টার'-এর পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়। ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে কৃষি কল সেন্টারের হটলাইন নম্বর ১৬১২৩-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

নিবন্ধ

শব্দদূষণ রোধে সচেতনতার বিকল্প নেই

জুয়েল মোমিন

শব্দদূষণ হচ্ছে নীরব ঘাতক। বর্তমানে শব্দদূষণ একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে শব্দদূষণের কারণে আগামী প্রজন্ম মানসিক ও শারীরিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শব্দদূষণের ফলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া, বধিরতা, হৃদরোগ, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হওয়া, ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় শব্দদূষণ বিধিমালা বলবৎ রয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারপরও শব্দদূষণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন আশু পদক্ষেপ গ্রহণের। সেক্ষেত্রে মানুষকে একদিকে সচেতন করতে হবে আবার শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনের কঠোর প্রয়োগও করতে হবে।

শহর এলাকায় শব্দদূষণের প্রকোপ গ্রামাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। ঘরের বাইরে, রাস্তায় বা কর্মস্থলেই নয়, ঘরে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ফুড ব্লেন্ডার ও গ্রাইন্ডার, পাখা থেকেও বিরক্তিকর শব্দ বের হয়। আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ১৯৯৬ সাল থেকে এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে ২০০৩ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। শব্দদূষণ, শব্দদূষণের ক্ষতিকারক দিকসমূহ, শব্দদূষণ রোধে করণীয় সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। যানবাহনের জোরালো হর্ন ও ইঞ্জিনের শব্দ, যানবাহন চলাচলের শব্দ, রেলগাড়ি চলাচলের শব্দ, বিভিন্ন নির্মাণকাজের শব্দ, মেশিনে ইট ও পাথর ভাঙার শব্দ, বিল্ডিং ভাঙার শব্দ, কলকারখানার নির্গত শব্দ, গ্রিলের দোকানে হাতুড়ি পেটার শব্দ, জেনারেটরের শব্দ, নির্বিচার লাউড স্পিকারের শব্দ, অডিও ক্যাসেটের দোকানে উচ্চ শব্দে গান বাজানোর শব্দ, উড়োজাহাজের শব্দ ইত্যাদি সবই শব্দদূষণের মধ্যে পড়ে।

শ্রবণশক্তি হ্রাসের ফলে বিরক্তি, নেতিবাচকতা ও রাগ, ক্লান্তি, চাপা উত্তেজনা, মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা, সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে পরিহার বা প্রত্যাহার, সামাজিক প্রত্যাখ্যান ও একাকিত্ব, সতর্কতা হ্রাস ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি বাড়া, স্মৃতিশক্তি ও নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা হ্রাস, কর্মক্ষমতা ও উপার্জন শক্তি হ্রাস এবং মানসিক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য খর্ব হয়ে থাকে। শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক ও শারীরিক সমস্যা ঘটতে পারে।

উচ্চ শব্দ শিশু, গর্ভবতী মা এবং হৃদরোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আকস্মিক উচ্চ শব্দ মানবদেহে রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয়, মাংসপেশির সংকোচন করে এবং পরিপাকে বিঘ্ন ঘটায়। হঠাৎ বিকট শব্দ যেমন যানবাহনের তীব্র হর্ন বা পটকা ফাটার আওয়াজ মানুষের শিরা ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেয়। উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ন মোটরযানের চালককে বেপরোয়া ও দ্রুত গতিতে যান চালাতে উৎসাহিত করে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। এই শব্দদূষণের ফলে আমাদের ট্রাফিক পুলিশও বধিরতাসহ মারাত্মকভাবে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

সময়ের সাথে ক্রমাগত ৮৫ ডেসিবলের উপরে শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি হতে পারে। শব্দ কতটা ক্ষতিকর তা ভলিউম এবং শব্দের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে শব্দ জোরে হলে শ্রবণশক্তির ক্ষতি হতে কম সময় লাগবে। আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকোপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথের মতে ৮৫ ডেসিবল শব্দে সর্বোচ্চ এক্সপোজার টাইম ৮ ঘণ্টা। ১১০ ডেসিবল শব্দে সর্বোচ্চ এক্সপোজার টাইম ১ মিনিট ২৯ সেকেন্ড। ৩ ডেসিবল বৃদ্ধিতে শব্দের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং এক্সপোজার টাইম প্রস্তাবিত সময়ের অর্ধেক। শব্দের মাত্রা ১৪০ ডেসিবলের উপর হলে এক এক্সপোজারেই শ্রবণশক্তির ক্ষতি হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সাধারণত ৬০ ডেসিবল শব্দ একজন মানুষকে অস্থায়ীভাবে বধির করতে পারে এবং ১০০ ডেসিবল শব্দ সম্পূর্ণভাবে বধিরতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বে বধিরতার হার ক্রমশই বাড়ছে। বিশ্বের ১৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো পর্যায়ের শ্রুতিক্ষীণতায় ভুগছেন। আবার তাদের অধিকাংশই শিশু, যারা আগামী দিনে জাতিকে এগিয়ে নেবে। আর বিশ্বের ৫ শতাংশ লোক বধিরতায় ভুগছেন, যা তাদের নিত্যদিনের কার্যক্রম এবং জীবন-জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। ২০০২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শ্রুতিক্ষীণতার হার ছিল ৭.৯ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শব্দদূষণের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরীর ৫০ শতাংশ মানুষ ৩০ ডেসিবল শব্দ শুনার ক্ষমতা হারাবে, শিশুদের মধ্যে বধিরতার হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে এবং তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও বিকার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ঘুম, রক্তচাপ এবং হজমের ক্ষেত্রে শারীরিক যে পরিবর্তন ঘটে তা শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং উন্নয়নশীল ভ্রূণের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্রেও সংযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমের ব্যাঘাতের সবচেয়ে সাধারণ কারণের একটি হচ্ছে শব্দ এবং যখন ঘুমের ব্যাঘাত ক্রমবর্ধমান হয় তখন স্বাস্থ্যের ওপর বড়ো ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে। ইউএস ইপিএ ঘুমের ব্যাঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ির ভেতরে শব্দের মাত্রা দিবাকালীন গড় ৪৫ ডেসিবল এবং রাত্রিকালীন ৩৫ ডেসিবল নির্ধারণ করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর অধীন 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬'-এর আওতায় নীরব, আবাসিক, মিশ্র, বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করতে পারবে না। নীরব এলাকা হচ্ছে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ইত্যাদি এবং এর চারপাশের ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। নীরব এলাকায় চলাকালে যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানো এবং মোটর, নৌ বা অন্য কোনো

যানে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সিটি করপোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে নীরব, আবাসিক, মিশ্র, বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করবে। এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। বিধি অনুযায়ী শব্দের মানমাত্রা নীরব এলাকায় দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫ ডেসিবল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০ ডেসিবল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবল। আর শব্দের দূষণ শুধু মানব সমাজের ওপরই খারাপ প্রভাব ফেলে না, অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও শব্দদূষণ মারাত্মক ক্ষতিকর। বন্য পরিবেশে শব্দদূষণ বন্যপ্রাণীদের শিকারের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, পাখিদের প্রজননে অসুবিধা করে ইত্যাদি। আমাদের জনজীবনে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে আমাদের চারপাশের শব্দদূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে।

আমরা যারা শব্দদূষণ সৃষ্টি করছি তারাও এর ক্ষতির শিকার। কাজেই সরকারের গৃহীত কর্মসূচির পাশাপাশি আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে। সবাই মিলে শব্দদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। শব্দ দূষণের উৎসসমূহ বন্ধ করার পাশাপাশি আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। শব্দদূষণের মতো এই মারাত্মক ঘাতক থেকে আপামর জনসাধারণকে রক্ষা করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা পালন করতে হবে।

করণীয়:

১. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

২. পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর ন্যস্ত আইনসিদ্ধ দায়িত্ব ও কর্তব্য আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা এবং বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

৩. সিটি করপোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ নিজ এলাকার মধ্যে নীরব, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প বা মিশ্র এলাকা চিহ্নিত করে সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করা।

৪. মোটরযান মালিক ও ড্রাইভারদের উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ন ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৫. নীরব এলাকায় হর্ন না বাজানো ও অন্যান্য এলাকায় অপ্রয়োজনে হর্ন না বাজানোর জন্য মোটরযান ড্রাইভারদের উদ্বুদ্ধ করা।

৬. উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। উচ্চ শব্দের হর্ন, উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী জেনারেটর ও যন্ত্রপাতি আমদানি বন্ধ করা।

৭. যানবাহন নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৮. লাউড স্পিকারের ব্যবহারে সচেতন হওয়া।

৯. কলকারখানায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

১১. জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সরকারি বিধিবিধান মেনে চলা।

একজন সুনাগরিক হতে হলে শুধু নিজের না, অন্যের জন্যও ভাবতে হবে। শব্দদূষণ সম্পর্কে শুধু নিজে সচেতন হলেই হবে না, তা সম্পর্কে অন্যকে জানাতে এবং সচেতন করে তুলতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। শহর-নগর-বন্দর সর্বত্র মানুষ শব্দদূষণের শিকার। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার করেছে আইন এবং এতে শাস্তির বিধানও রয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, শব্দদূষণ রোধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়নও প্রয়োজন।

জুয়েল মোমিন: প্রাবন্ধিক

ভুটানি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

ভুটানের জংখা ভাষায় অনূদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন ভুটানের প্রিন্সেস ডেচেন ইয়াংজোম ওয়াংচুক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভুটানে সফররত বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। ৩১শে মার্চ ভুটানের রাজধানী থিম্পুর জিচেনখার মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। থিম্পুস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এবং ভুটানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ভুটান স্টাডিজ (সিবিএস)-এর কমিশনার ও ভুটানের প্রখ্যাত লেখক দাশো কর্মা উড়ার নেতৃত্বে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটি জংখা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

অনূদিত গ্রন্থটি থিম্পুর পিটি প্রিন্টিং থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তান্ডিন ওয়াংচুক, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ইয়ন্তেন ফুন্টশো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিয়েনপো শেরিং, শিল্প-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী নামগিয়াল দরজি, ভুটানে নিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত প্রমুখ।

প্রতিবেদন: ফাইজা ইসলাম

দুর্ঘটনা

হেলাল উদ্দিন আহমেদ

'আমি তোমাকে বলছি, এ-ই সেই মহিলা, কোনো সন্দেহ নেই'। ক্যাপ্টেন হাওলাদার তার বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কবির এত নিশ্চিত আর এত উৎসাহী না হলেই ভালো হতো, তিনি ভাবলেন। সমুদ্রে তার কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ো ক্যাপ্টেন এটুকু শিখেছেন যে তার নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুতে নাক গলানো মোটেই সমীচীন নয়। তার বন্ধু, প্রাক্তন সিআইডি সুপার কবির আশরাফের জীবন-দর্শন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'প্রাপ্ত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে কাজ'– কর্মজীবনের প্রথম দিককার এই দর্শনকে কবির শেষ পর্যন্ত 'নিজেই নিজের সংবাদ খুঁজে নেওয়া'তে উন্নীত করেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট কবির ছিল একজন সুচতুর, সদাজাগ্রত কর্মকর্তা, যার জন্য তার প্রাপ্য পদোন্নতির সবগুলোই সে একে একে পেয়েছিল। এমনকি চাকরি থেকে অবসর নেওয়া এবং এই মফস্বল শহরের একপ্রান্তে কুমার জীবন অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও তার চমৎকার পেশাদারি প্রবৃত্তি এখনো সচল ছিল। 'একবার দেখলে কারও মুখ চিনতে আমার ভুল হয় না', কবির দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। 'মিসেস রহমান– হ্যাঁ তিনি নিশ্চিতভাবেই মিসেস রহমান'।

ক্যাপ্টেন হাওলাদার অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন। কবিরের পরে খন্দকাররাই হলো তার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। মিসেস খন্দকার কোনো ঘটনার সাথে জড়িত ছিল এটা শুনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই আহত হলেন। 'সে তো অনেক বছর আগের কথা'। 'নয় বছর', কবিরের নির্ভুল জবাব, 'নয় বছর তিন মাস'।

'তোমার কেইসটার কথা মনে আছে'?

'হ্যাঁ, ঝাপসা মনে আছে। রহমান আর্সেনিক খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিল, ফলে তার স্ত্রীকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো। তাছাড়া আর কী-ই-বা করতে পারত? কিচ্ছু না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অকাট্য রায়। একেবারে নির্ভুল'।

'তাহলে তো ঠিকই আছে; আমিতো বুঝছি না কী নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যাথা'!

'যা ঘটার ঘটে গেছে'– প্রসঙ্গের ইতি টানার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন। 'মিসেস খন্দকারকে যদি খুনের দায়ে বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং ছাড়া পাওয়ার মতো দুর্ভাগ্যের শিকার...'

'ছাড়া পাওয়াকে দুর্ভাগ্য বলা যায় না', কবির বাধা দিলো।

'আমি কী বোঝাতে চাইছি তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছ', ক্যাপ্টেন বিরক্ত হলেন। 'বেচারি মহিলাকে যখন সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার শিকার হতেই হয়েছিল, সেটা পুনরুজ্জীবিত করার অধিকার আমাদের নেই'।

কবির কোনো জবাব দিলো না। 'মহিলা নির্দোষ ছিল– একটু আগে তুমি তো তা-ই বললে'?

'আমি বলিনি তিনি নির্দোষ ছিলেন। আমি বলেছি তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন'।

'ওই একই কথা'।

'সবক্ষেত্রে নয়'।

'হোল্ড অন, হোল্ড অন, বাতাস তাহলে সেদিকে? তুমি মনে করছ তিনি নির্দোষ ছিলেন না'?

'আমি তা বলব না, আমি– মোট কথা আমি জানি না। রহমান আর্সেনিক খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিল। তার স্ত্রী সেটা জোগাড় করে আনত। একদিন ভুলক্রমে সে অতিরিক্ত পরিমাণ খেয়ে ফেলল। এখন প্রশ্ন হলো: ভুলটা কি তার নিজের, নাকি তার স্ত্রীর? কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি; বিচারকও বেনেফিট অব ডাউটে মিসেস রহমানকে ছেড়ে দিলেন। ওসব ঠিক আছে এবং আমি তাতে কোনো দোষও খুঁজে পাইনি। ব্যাপারটা হচ্ছে, আসল ঘটনাটা জানার ব্যাপারে আমি এখনও আগ্রহী'।

ক্যাপ্টেন হাওলাদার তার পাইপের দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করলেন, 'টিকটিকি সাহেব', আরামের সুরে তিনি বললেন, 'এসবে আমাদের কী এসে যায়'?

'আমি নিশ্চিত নই...'।

'কিন্তু নিশ্চয়ই...'।

'আমার কথা এক মিনিট শোন। এই ভদ্রলোক– খন্দকার– আজ সন্ধ্যায় তার ল্যাবরেটরিতে কী বলেছিলেন তোমার মনে আছে'?

'হ্যাঁ, আর্সেনিকের জন্য মার্শের বিশ্লেষণের কথা বলছিলেন। বললেন, এসব তুমি জানো, কারণ এটা তোমার বিষয়। তিনি নিশ্চয়ই এটা বলতেন না যদি জানতেন...'।

কবির কথার মাঝখানে তাকে বাধা দিলো, 'তারা বিবাহিত কতদিনের? তুমি জানিয়েছ ছয় বছরের। আমি বাজি ধরে বলতে পারি– তার স্ত্রীই যে সেই কুখ্যাত মিসেস রহমান তা তিনি ধারণার মধ্যেই রাখেন না'।

'আর তিনি অন্তত আমার কাছ থেকে সে ধারণা পাবেন না', সোজা হয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন হাওলাদার।

কবির কর্ণপাত না করে বলতেই থাকলো, 'তুমি এইমাত্র আমাকে বাধা দিলে। রসায়নে যেমন বিভিন্ন যৌগ ও মৌলের বিশ্লেষণ-পরীক্ষা থাকে, তেমনি আমার পেশায়ও অনেক রকম পরীক্ষা আছে। যেমন খুনের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। সেটা করা হয় সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য যোগ, বিয়োগ ও ওজন করে, সাক্ষ্য-প্রমাণের সম্ভাব্য ত্রুটি স্বীকার করে, অবশিষ্টকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। কিন্তু খুনের আরেকটি পরীক্ষা আছে যা প্রায় নির্ভরযোগ্য, কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। একজন খুনি একটি অপরাধ করে কদাচিৎ বসে থাকে। তাকে সময় দাও, আর সেই সঙ্গে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখ, দেখবে সে ঠিক আরেকটি খুন করে বসে আছে। তুমি কোনো একজন লোকের কথা বিবেচনা কর– সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে কি করেনি? হয়ত দেখা যাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো অকাট্য প্রমাণ নেই। তার অতীতের দিকে তাকাও। যদি দেখ তার আরও স্ত্রী ছিল এবং তাদের সবাই-ই- কী বলব– অদ্ভুতভাবে মারা গেছে? সেক্ষেত্রে তুমি জানো আমি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি না, তুমি বুঝতেই পারছ। আমি বলছি নৈতিক নিশ্চয়তার দিক থেকে। আর একবার যদি তুমি জানো, প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তুমি বেরিয়ে পড়তে পারো'।

'হুঁ'।

'এবার আমি আসল কথায় আসছি। কোনো খুনিকে তার প্রথম অপরাধের সময় ধরতে পারলে কী হবে? সেক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু যদি দোষী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়, আর অন্য নামে জীবন শুরু করে– তাহলে? খুনি একই অপরাধ করবে কি করবে না'?

'এটা একটা ভয়ংকর কল্পনা'!

'তুমি কি এখনও বলতে চাইছ এটা আমাদের ব্যাপার নয়'?

প্রাক্তন সুপার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম আমরা মহিলার অতীত ঘেঁটে কিছু পাইনি। আসলে তা সত্যি নয়। তার এক বিপিতা ছিল। আঠারো বছর বয়সে এক যুবকের প্রতি মহিলা আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তার বিপিতা তাদের সম্পর্ক গাঢ় হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একদিন সে ও তার বিপিতা খাদ-সংলগ্ন খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটতে বেরোয়। কিন্তু হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বিপিতা কিনারের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, কিনার ধসে পড়ে ও সে গভীর খাদে পড়ে মারা যায়। তুমি কি মনে কর এটা একটি দুর্ঘটনা ছিল? দুর্ঘটনা? রহমানের মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক সেবনও ছিল দুর্ঘটনা। মহিলাকে বিচারই করা হতো না যদি না অন্য কেউ তার জীবনে জড়িত না হতো। তবে ভদ্রলোক নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছিলেন, আমি তার সঙ্গে আলাপও করেছিলাম। মনে হয়েছিল, বিচারের রায়ে বিচারকেরা সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমি তোমাকে বলছি হাওলাদার, যেখানে এই মহিলা উপস্থিত থাকে, সেখানে আরেকটি 'দুর্ঘটনা' ঘটার সম্ভাবনা শতকরা একশত ভাগ'।

বুড়ো ক্যাপ্টেন তার কাঁধ দুটো ঝাঁকালেন, 'ঘটনাটি তো প্রায় নয় বছর আগে ঘটেছে। এখন কেন আবার তোমার ভাষায় যা 'দুর্ঘটনা' সেটা ঘটতে যাবে'?

'আমি এখনকার কথা বলিনি। আমি বলেছি কোনো না কোনো দিন; যদি উপযুক্ত মোটিভ-এর উদ্ভব হয়'।

ক্যাপ্টেন হাওলাদার আবার তার কাঁধ ঝাঁকালেন, 'আমি বুঝছি না সে দুর্ঘটনা তুমি কীভাবে ঠেকাবে'?

'সেটাইতো সমস্যা', চিন্তিতভাবে বলল কবির।

'আমি হলে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না'। বললেন ক্যাপ্টেন। 'অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানোর ফল কখনও ভালো হতে পারে না'।

কিন্তু সে উপদেশটি প্রাক্তন সুপারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে ছিল ধৈর্যশীল, কিন্তু একই সঙ্গে দৃঢ়চেতা। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে রাস্তায় হাঁটতে বেরুলো, মাথায় তার একটাই চিন্তা– কী করে আরেকটি খুন ঠেকানোর কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করা যায়।

কিছু স্ট্যাম্প ক্রয়ের উদ্দেশে পোস্ট অফিসে প্রবেশ করা মাত্রই তার দুশ্চিন্তার বস্তুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কবিরের। তার নাম আবেদ খন্দকার, রসায়নের প্রাক্তন অধ্যাপক। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, আচরণে নম্র-ভদ্র, সব সময়েই আনমনা। তিনি কবিরকে চিনতে পারলেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ও করলেন। কিন্তু এসব করতে গিয়ে তার হাত থেকে কয়েকটা চিঠি মাটিতে পড়ে গেল। সবচেয়ে উপরের চিঠিটার দিকে দৃষ্টি যেতেই চমকে উঠল কবির। একটি নামকরা বীমা কোম্পানির নাম– বড়ো বড়ো হরফে লেখা।

সঙ্গে সঙ্গে কবির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সরল অধ্যাপক টেরই পেল না কীভাবে প্রাক্তন সুপার অনেক দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে হাঁটার কাজটি সেরে নিলো, আর কীভাবেই বা প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হতে হতে জীবনবীমাতে এসে ঠেকল। উদ্দেশ্য সাধন করতে কবিরকে কোনোও বেগই পেতে হলো না। আবেদ খন্দকার নিজে থেকেই জানিয়ে দিলেন– তিনি স্ত্রীর স্বার্থে নিজের জীবনবীমা করেছেন; অধিকন্তু, তিনি কবিরের কাছে জানতে চাইলেন কথিত কোম্পানিটি কেমন? 'আমি কিছু অলাভজনক বিনিয়োগ করেছি', তিনি ব্যাখ্যা করলেন। 'ফলে আমার আয় কমে গেছে। এখন আমার যদি কিছু হয়, তাহলে আমার স্ত্রী অর্থকষ্টে পড়বে; তাই এই বীমাটি করা'।

'তিনি এতে আপত্তি করেননি'? কবির কথাচ্ছলে জানতে চাইলো। 'কিছু কিছু মহিলা এসবে আপত্তি করে থাকে– এই ভেবে যে তা অশুভ পরিণতি ডেকে আনে'।

'দেখুন, নীনা অত্যন্ত বাস্তববাদী', অধ্যাপক হেসে জবাব দিলেন। কোনোরকম কুসংস্কারে সে বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বলতে কী, জীবনবীমা করার এই আইডিয়াটা আসলে তারই। সে চায় না আমি অযথা দুশ্চিন্তায় ভুগি'।

যা সে জানতে চেয়েছিল কবিরের তা জানা হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খন্দকারের কাছ থেকে বিদায় নিলো, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছায়া। মরহুম রহমান সাহেবও মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে তার স্ত্রীকে নমিনি করে জীবনবীমা করেছিলেন।

নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আস্থাশীল কবির মনে মনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হলো। কিন্তু কীভাবে সে কাজে নামবে সেটাই হয়ে পড়লো সমস্যা। একজন অপরাধীকে হাতেনাতে ধরা তার উদ্দেশ্য নয়। বরং একটা অপরাধ সংঘটনে বাধা দেওয়াটাই তার লক্ষ্য। প্রথম কাজটি হতে দ্বিতীয় কাজটি করা অনেক বেশি দুরূহ। সারাদিন ধরেই কবির চিন্তাচ্ছন্ন রইল।

সেদিন বিকেলে শহরের এক প্রান্তে মেলা বসেছিল; আর তা-ই দেখতে কবির বেরিয়ে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে এটা-ওটা কেনার পর পাঁচ টাকার বিনিময়ে এক জ্যোতিষীকে নিজের হাত দেখালো কবির; মনে মনে হাসলো এই ভেবে যে তার কর্মজীবনে এদেরই বিরুদ্ধে সে কতরকম ব্যবস্থাই না নিয়েছিল।

জ্যোতিষীর প্রথম দিককার কথাগুলোকে সে বিশেষ আমল দিলো না। কিন্তু একটু পরেই তার কান সজাগ হয়ে উঠল। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আপনি কারও জীবন-মৃত্যুতে জড়িয়ে পড়বেন; কারও বাঁচা-মরা নির্ভর করবে আপনারই ওপর'।

'অ্যাঁ, কী বললে'? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কবির জিজ্ঞেস করল।

'একটি সিদ্ধান্ত, হ্যাঁ, একটি সিদ্ধান্ত আপনার নেওয়ার আছে। সবকিছু নির্ভর করবে সেই সিদ্ধান্তের ওপর। আপনাকে খুব সাবধানি হতে হবে; একটু ভুল করেছেন কী ...', জ্যোতিষী শিউরে উঠল। প্রাক্তন সুপার কবির আশরাফ জানতো এগুলো বাজে কথা; তবুও কথাগুলো তার মনে ছাপ ফেলল।

'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, একটি ভুলও করবেন না; যদি করেন, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু'।

অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত; মৃত্যু! অবাক হলো কবির।

'আমি একটি ভুল করলে কারও মৃত্যু হবে, তাই নয় কি'?

'জ্বী, তা-ই'।

'সেক্ষেত্রে আমার ভুল করলে চলবে না'। পাঁচটি টাকা দিয়ে বিদায় নিলো কবির। তার চোখে-মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। হ্যাঁ, একটি জীবন, একটি মূল্যবান জীবন তার সময়োচিত পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করছে।

কবির উপলব্ধি করল, তাকে সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই। দূরে ক্যাপ্টেন হাওলাদারের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। না, সেখানে সাহায্যের কোনো আশা নেই। 'যা হবার তা হতে দাও'– হলো হাওলাদারের জীবনদর্শন; এক্ষেত্রে তাতে কোনো কাজ হবে না।

হাওলাদার একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। মহিলা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবিরের দিকে এগিয়ে আসলেন। প্রাক্তন সুপার মুহূর্তেই চিনতে পারল মিসেস খন্দকারকে। সে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে তার যাত্রাপথে স্থাপন করল।

মিসেস খন্দকার একজন অত্যন্ত সুশ্রী মহিলা। টানা টানা ভুরু, চমৎকার বাদামি চোখ, আর শান্ত-সমাহিত মুখাবয়ব। দেখতে অনেকটা ইতালীয় ম্যাডোনার মতো। গাঢ় কিন্তু নিদ্রালু গলার স্বর। কবিরের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন; একটি তুষ্ট, অভ্যর্থনাসূচক হাসি।

'কী করছেন মিসেস রহমান– থুক্কু মিসেস খন্দকার'? কবির ইচ্ছা করেই ভুলটা করল; তারপর না দেখার ভান করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল। দেখল মহিলার চোখ হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছে, আর নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির, গর্বিত ভঙ্গিতে তাকালেন মিসেস খন্দকার, 'আমি আমার স্বামীকে খুঁজছিলাম'। তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি দেখেছেন কোথাও'?

'একটু আগে মেলার ওদিকে দেখেছিলাম', কবির আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করল। আলাপ করতে করতে তারা সেদিকেই হাঁটা দিলো। মহিলাটির প্রতি প্রাক্তন সুপারের শ্রদ্ধাবোধ বেড়েই চলল। কথাবার্তায় কী আত্মসংযম, চালচলনে কেমন মানসিক স্থিরতা! একজন অসাধারণ মহিলা, বিপজ্জনকও বটে। একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক মহিলা!

তার প্রথম পদক্ষেপের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকলেও কবির মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিল। মহিলাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তার পরিচয় কবিরের অজ্ঞাত নয়। এটা নিশ্চয়ই তাকে সাবধানি করে তুলবে। তিনি নিশ্চয়ই হঠাৎ কিছু করার চেষ্টা করবেন না। মনে মনে খন্দকারের কথা স্মরণ করল কবির। তাকে যদি সাবধান করে দেওয়া যেত...'!

ক্ষুদ্রকায় মানুষটিকে তারা একটি চীনামাটির পুতুল পরীক্ষারত অবস্থায় খুঁজে পেল। তার স্ত্রী বাড়ি যাওয়ার কথা বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। মিসেস খন্দকার প্রাক্তন সুপারের দিকে ফিরলেন, 'আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলুন না, এক কাপ চা খাবেন'? গলার স্বরে কেমন চ্যালেঞ্জের সুর– কবিরের মনে হলো। 'ধন্যবাদ', কবির আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। খোশগল্প করতে করতে তারা এগুতে লাগল। সূর্য তখন তীর্যকভাবে আলো ছড়াচ্ছিল, বাতাস বইছিল মৃদুভাবে। আশপাশের সবকিছুই কেমন যেন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা।

ছোট্ট ছিমছাম বাসাটিতে এসে মিসেস খন্দকার জানালেন কাজের মেয়ে মেলায় গেছে। কাজেই তাকেই চা বানাতে হবে। বৈদ্যুতিক চুল্লির ওপর চায়ের কেটলিটা বসালেন মিসেস খন্দকার। তারপর নিকটবর্তী শেলফ থেকে তিনটি চায়ের পাত্র ও পিরিচ নিলেন। 'আমাদের কাছে এক বিশেষজাতীয় চীনা চা আছে', তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'আমরা কাপে না খেয়ে এসব বড়ো পাত্রেই তা পান করে থাকি'।

একটি পাত্রের ভেতর উঁকি মেরে দেখে রাগতভাবে তিনি তার জায়গায় আরেকটি রাখলেন। 'আবেদ, মোটেই ভালো কথা নয়, তুমি এগুলো আবার ল্যাবে নিয়েছিলে'? খন্দকার ক্ষমা চেয়ে

বললেন, 'দ্যাখ, এগুলোর আকার ভীষণ সুবিধাজনক; তাছাড়া আমি যে অর্ডার দিয়েছিলাম সেগুলোতো এখনও এসে পৌঁছায়নি'।

'কোনো একদিন নির্ঘাত বিষ খাইয়ে মারবে', মিসেস খন্দকার বাঁকা হাসি হেসে বললেন। 'আসিয়া এগুলো ল্যাব থেকে নিয়ে আসে ঠিকই; কিন্তু লক্ষণীয় কিছু না পেলে ধোয়ার কষ্টটুকু করে না। কেন, সেদিন তো তুমি পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে পরীক্ষা করছিলে! দ্যাখ আবেদ, এগুলো কিন্তু খুবই বিপজ্জনক'!

খন্দকারকে একটু বিরক্ত মনে হলো। 'ল্যাব থেকে জিনিসপত্র সরানো আসিয়ার কাজের মধ্যে পড়ে না। তাকে নিষেধ করে দিও'।

'কিন্তু চা খাওয়ার পরে তো আমরা অনেক সময়েই ল্যাবে পাত্র রেখে আসি; আসিয়া কী করে বুঝবে? বুঝতে চেষ্টা কর'।

অধ্যাপক আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে পাশের ল্যাবে প্রবেশ করলেন; আর তার মিসেস একটি মধুর হাসি হেসে চায়ে ফুটন্ত পানি ঢেলে বৈদ্যুতিক চুলা অফ করে দিলেন।

কবিরের কাছে ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছিল। অকস্মাৎ সে অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। মিসেস খন্দকার কি আগেভাগেই নিজের সাফাই গাইছেন? এটাই কি তবে সেই বহুল প্রতীক্ষিত দুর্ঘটনা? মহিলা কি এতক্ষণ ধরে তার অ্যালিবি সংগ্রহ করে নিলেন, যাতে করে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, কবিরকে বিচারে তার পক্ষেই সাক্ষ্য দিতে হবে? যদি মহিলা সেটা মনে করেই থাকেন তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন, কবির জোরে নিশ্বাস নিলো।

মিসেস খন্দকার তিনটি পাত্রেই চা ঢাললেন। একটি পাত্র রাখলেন কবিরের সামনে, একটি তার নিজের চেয়ারের সামনে, আর তৃতীয়টি তার স্বামী যেখানে বসেন সেই ছোট্ট টেবিলটার উপর। তৃতীয়টি যখন তিনি রাখছিলেন তার ঠোঁটে তখন এক অদ্ভুত বাঁকা হাসি খেলে গেল।

সেই হাসিটিই কাজের কাজ করলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই কবির জেনে গেছে।

একজন অসাধারণ মহিলা; একজন অতি বিপজ্জনক মহিলা; কোনো অপেক্ষা নয়, কোনো প্রস্তুতি নয়। ঠিক এই বিকেলেই, এই বিশেষ বিকেলেই, তাকে সাক্ষী রেখে! ঘটনার দ্রুততা ও আকস্মিকতায় কবিরের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো!

সুচতুর, অত্যন্ত সুচতুর! কবির কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। মহিলা ধরে নিয়েছে কবির সন্দেহ করবে না, কারণ ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে যাচ্ছে। বিদ্যুতের মতো গতিশীল বুদ্ধি ও কর্মশক্তির অধিকারিণী বটে। কবির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। গভীর একটি নিশ্বাস নিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকলো। 'মিসেস খন্দকার, মাঝে-মধ্যে আমার মাথায় কিছু অদ্ভুত খেয়াল চাপে। আপনি কি সে-রকম একটি খেয়ালকে বাস্তব রূপ দিবেন'?

মিসেস খন্দকার সংশয়মুক্ত কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে কবিরের দিকে তাকালেন।

কবির উঠে দাঁড়ালো, মহিলার সামনে রাখা চায়ের পাত্রটি নিলো, তারপর ছোট্ট টেবিলে রাখা পাত্রের সঙ্গে সেটার স্থান-বিনিময় করল। অন্য পাত্রটি এনে মহিলার সামনে রেখে কবির বলল, 'আমি চাই আপনি এই চা'টুকু এখনই আমার সামনে পান করুন'।

মহিলার চোখ কবিরের সামনে এসে স্থির হলো; অটল, দুর্বোধ্য! কিন্তু পরমুহূর্তেই সমগ্র মুখাবয়ব হতে সবটুকু রং অপসারিত হয়ে কেমন ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হয়ে গেল।

মিসেস খন্দকার তার হাত বাড়ালেন আর কাপটি তুলে নিলেন। কবির তার নিশ্বাস বন্ধ রাখল। নাকি সে পুরো ব্যাপারটিতেই মস্ত ভুল করে চলেছে?

মিসেস খন্দকার কাপটি তার ঠোঁটে ঠেকালেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে শিউরে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকলেন; তরল পদার্থটি দ্রুত কাছে থাকা টবে ফেলে দিলেন। এরপর পেছনে হেলান দিয়ে তিনি উদ্ধত দৃষ্টিতে কবিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কবির নিশ্চিন্ত হয়ে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো; তারপর ধপাস করে সোফায় বসে পড়ল।

'তারপর'? মিসেস খন্দকার বললেন। তার গলার স্বরে পরিবর্তন এসেছে; কেমন বিদ্রুপাত্মক ও উদ্ধত।

কবির ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলো, 'আপনি অত্যন্ত সুচতুর মহিলা মিসেস খন্দকার। আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন। কোনোক্রমেই যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়। বুঝতেই পারছেন আমি কী বোঝাতে চাইছি?

'আমি বুঝেছি', মহিলার গলার স্বর কেমন একঘেঁয়ে, আবেগশুন্য মনে হলো।

'আপনার এবং আপনার স্বামীর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি', কবির চায়ের পাত্রে ঠোঁট ঠেকালো। কিন্তু চা মুখে দেওয়ার পরপরই কবিরের মধ্যে পরিবর্তন এলো, তার মুখ ভয়ংকরভাবে মোচড় খেল। সে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, চিৎকার দেওয়ারও চেষ্টা করল। তার সমস্ত শরীর কঠিন হয়ে এলো, মুখ হলো রক্তশূন্য। হাত-পা ছড়িয়ে কবির পেছন দিকে ঢলে পড়ল নিঃসাড় হয়ে।

মিসেস খন্দকার সামনের দিকে ঝুঁকলেন। একটি সংক্ষিপ্ত হাসি তার ঠোঁটে দ্রুত খেলে গেল। অত্যন্ত নরম, ভদ্র স্বরে তিনি বললেন, 'আপনি একটি মারাত্মক ভুল করেছেন জনাব কবির আশরাফ; আপনি ভেবেছিলেন আমি আবেদকে খুন করতে চেয়েছি? কী বোকামি, কী নির্বুদ্ধিতা!

মহিলা মৃত মানুষটির দিকে তাকিয়ে আরও এক মিনিট বসে রইলেন। এ তৃতীয় ব্যক্তি যে তার পথ মাড়াতে চেয়েছিল, তার মনের মানুষ হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। তার হাসি আরও বিস্তৃত হলো। সে মুহূর্তে তাকে সত্যিকারের ম্যারাডোনার মতোই দেখাচ্ছিল।

গলার স্বর তিনি উঁচুতে উঠালেন; ডাকলেন, 'আবেদ! আবেদ! তাড়াতাড়ি এসো। হায় হায় হায়! একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে! বেচারা কবির আশরাফ...'।

— ০ —

[আগাথা ক্রিস্টির 'অ্যাক্সিডেন্ট' গল্পের ভাবানুবাদ। অনুবাদক ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, hahmed1960@gmail.com]

সাহস

কামাল হোসাইন

তীব্র এক চিৎকার দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আম্বিয়া বানু। ভোরবেলার সেই চিৎকারে গোটা এলাকার সব নীরবতা যেন মুহূর্তে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এই চিৎকারে পাশের বুনোঝোপ থেকে একঝাঁক পাখি প্রাণ কাঁপিয়ে সেই সংবাদ যেন রাষ্ট্র করে দিতে বেরিয়ে পড়ল।...

অবোধ দুই শিশু শায়লা আর শামিল। তাদের বাবা শাহজাহান মিয়া। শামিল জন্ম নেওয়ার দুবছর পরই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়েছেন। শায়লার ছোটো ভাই শামিল। অসুখটার বয়স দিনে দিনে কম হয়নি। দুবছর আগেই তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল ঘাতক ব্যাধিটা। অভাবের সংসার তাদের। তাই তেমন করে চিকিৎসা করাতে পারেননি।

শাহজাহান মিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে দেশ বাঁচাতে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন তিনি। ১১ নম্বর সেক্টরের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যুদ্ধ করে ভয়ানক বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারলেও নিজের ভেতরে বেড়ে ওঠা ঘাতক ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে গেলেন শাহজাহান মিয়া।

দেশের ক্রান্তিলগ্নে ভূমিকা রাখার সুবাদে তার চোখের সামনে অনেকেই অনেক ফায়দা হাসিল করেছেন। কিন্তু শাহজাহান মিয়া সেদিকে হাঁটেননি। তিনি বলতেন, কোনো সুযোগ নেওয়ার জন্য দেশের জন্য অস্ত্র ধরিনি আমি। এটা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল। আমি ঠিক সেই কর্তব্যটাই পালন করেছি। সেজন্য আমাকে সুবিধা নিতে হবে কেন? যারা এটা করেন, তাদেরকে তিনি সুবিধাবাদী মনে করেন। এমনকি তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোনো সনদপত্রও গ্রহণ করেননি। তিনি কখনো কোথাও নিজে থেকে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছেন, তা বলেননি। সেই পরিচয় তিনি দেননি কখনো। তবে কেউ শুনতে চাইলে তিনি যুদ্ধের অপরাপর ঘটনা বলতেন বেশ নাটুকে ভঙ্গিতে। শাহজাহান মিয়া গ্রামে যাত্রাদলে অভিনয় করতেন। এজন্য যে-কোনো কিছু বর্ণনার সময় অভিনয়ের মিশেলে বলতে পছন্দ করতেন।

তবে শাহজাহান মিয়ার দেশমাতৃকার জন্য অপরিসীম অবদানের কথা সবাই জানে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার হার না মানা আত্মপ্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ফলপ্রসূ হয়েছে। রণাঙ্গনের সেসব অসামান্য গল্প খুব গর্বের সঙ্গে বলতেন শাহজাহান মিয়া আম্বিয়া বানুর কাছে। কাছে বসে শুনত শায়লা। শামিল কিছু না বুঝলেও সেখানে হাজির থাকত। তারপর সবই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গেছে তাদের জীবন থেকে।

শাহজাহান মিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে শায়লার মা আম্বিয়া বানু অনেকবার বলেছিলেন ভালো কোনো ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু শাহজাহান মিয়া সে-কথা কানে তোলেননি। তিনি জানেন তার সংসারের অবস্থা। সঙ্গতি কতটা তাও তার অজানা নয়। দুরারোগ্য এই ব্যাধি যে সর্বস্ব খোয়ানোর ব্যাধি, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। বড়োলোকের এই ব্যাধি ছোটোঘরে যে বড্ড বেমানান!

পারতেন তিনি বড়ো কোনো ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে। কিন্তু তা হতো তাদের দুসন্তান নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারানোর বিনিময়ে। সেকথা ভাবতেই যে তার বুকের ভেতরটায় অব্যক্ত ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। সে কারণে ওই চিন্তা তিনি বাদ দিয়ে ভেতরে ভেতরে অসুখটাকে দমনে কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহসী হননি। এর বাইরে থাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পাতা। কিন্তু তা তিনি কোনোদিনই পারবেন না। এ স্বভাব যে সবার থাকে না!

আর এই চিকিৎসায় যে পরিমাণ পয়সা দরকার, তা কি আর অন্যের সাহায্য নিয়ে মেটানো সম্ভব?

আর তাই যা হবার তাই হলো। এক রাতে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে। শায়লাদের পানিতে ভাসিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন শাহজাহান মিয়া।

ছোটো দুটো বাচ্চা নিয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়লেন আম্বিয়া বানু। দুচোখে অন্ধকার নেমে এলো তার। শাহজাহান মিয়া শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তেমন কিছু কাজকর্ম করতে না পারলেও একটা অবলম্বন ছিল এতদিন। কিন্তু আজ সত্যি-সত্যিই তিনি অকূল দরিয়ায় পড়ে গেলেন। কীভাবে সাঁতরাবেন এই মহাসমুদ্রে, তিনি জানেন না। বোবা কান্না এসে ঘিরে ধরে তাকে।

কদিন কেঁদেকেটে বুক ভাসালেন সন্তান দুটোকে জড়িয়ে ধরে। ওরাও দুজন অবুঝ ছেলেমেয়ে। শায়লা কিছুটা বুঝলেও শামিলের বুঝার মতো বয়স হয়নি তখন। মা আর বোনটাকে বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত কেবল। কিছু না বুঝে এক সময় শামিলও হাপুসনয়নে কেঁদে উঠত।

কদিন পাড়াপ্রতিবেশীরা ওদের খোঁজখবর রাখত। সময়ে সময়ে খাবার দিত। বাচ্চা দুটোর মাথায় হাত বুলিয়ে সমবেদনা জানাতো। এই সময়ে ভেঙে না পড়তে আম্বিয়া বানুকে সাহস দিত। তাদের কেউ কেউ বলেছে বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে সুস্থ থাকতে হবে। শক্ত হতে হবে। যে যাবার সে তো চলে গেছে। এখন তাকেই ওদের মানুষ করতে মনযোগী হতে হবে। ভঙ্গুর এই সংসারের হাল ধরতে হবে।

সত্যিই তাই। আম্বিয়া বানু উপলব্ধি করলেন, তার আর পেছনে তাকানোর সময় নেই। কিছু একটা করতে হবে তাকেই। না হলে পেটে দেবার মতো দুবেলা-দুমুঠো কোথায় পাবেন তিনি? নিজের কথা অতটা ভাবেন না তেমন। বাচ্চাদের নিয়েই এখন তার বড়ো চিন্তা।

কী করবেন তিনি? বাচ্চাদের কোনোরকম সামান্য কিছু খাইয়ে রাতের বেলা ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। নীড়হারা পাখির মতো হাঁসফাঁস করতে থাকেন। আজকাল আম্বিয়া বানুর গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না। বিলাপ করতে করতে চোখ পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। এখন আর চোখ দিয়ে পানি আসে না। পাথরের চোখ যেন তার! যাতে আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না।

আকাশ-পাতাল ভাবনার মাঝে গভীর রাত নেমে আসে সেদিনও। সব এক সময় সুনসান হয়ে যায়। আকাশের চাঁদটা কেবল একা একা

জেগে থাকে। আর জেগে থাকে আম্বিয়া বানু। ঘুমহীন রাত জেগে ভাবতে ভাবতে কখন রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে আসে, বুঝতে পারেন না তিনি। এই জেগে থেকে কোনো কিনারাও করতে পারেন না। হাতে তার নগদ কোনো টাকা-পয়সা নেই। যা সামান্য কটা টাকা ছিল, তা এ কয়দিনে শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রায় নিঃস্ব তিনি।

আরেক রাত। সেদিনও মুখে দেবার মতো তেমন কিছুই ঘরে ছিল না। আম্বিয়া বানুর স্বভাবটাও শাহজাহান মিয়ার মতোই রয়ে গেছে। মুখ ফুটে কারো কাছে কিছুই চাইতে পারেন না তিনি। এই না পারার কষ্টে একা একাই ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে কাঁদেন। আর মনে মনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন।

বাচ্চা দুটোর মুখে এখনো কিছু দিতে পারেননি। এই কষ্টে বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। ঘরে হারিকেনের টিমটিমে আলো। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছেন তিনি। আকাশ-পাতাল চিন্তা তার মনে। এ সময় ঘরের বাইরে কিসের যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল। আম্বিয়া বানুর ধ্যান ভাঙল তাতে। সজাগ হয়ে উঠলেন। তখন অতটা রাত না হলেও রাত নামার আগেই গ্রামের রাত আগেই নেমে আসে। মোটামুটি এ সময় গ্রামে সব সুনসান হয়ে পড়ে। মানুষের চলাচল কমে যায়। বেড়ে যায় রাতচরা পোকামাকড় আর শেয়াল-বনবেড়ালের চলাচল। আর চলে চোর-ছ্যাঁচড়ের আনাগোনা। অবশ্য তার সম্পর্কে মোটামুটি সবাই জানে। তার ঘরে নেবার মতো যে কিছু নেই, এটা কারোরই অজানা নেই।

কিন্তু এই রাতে উঠোনে তাহলে কে এলো? উঠে বসলেন তিনি। সামান্য গলা চড়িয়ে বললেন, কে গো উঠোনে?

— অ বউ, ঘুমাইছ নাকি? ওঠোদিন দিকি।

গলার স্বরে আম্বিয়া বানু আশ্বস্ত হলেন। বুঝলেন, তিনি গুলনাহার চাচি। এত রাতে তিনি কেন ডাকছেন তাকে, বুঝতে পারলেন না। হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে উঠে ঘরের দরজা খুললেন।

তারপর দেখলেন টর্চলাইট হাতে গুলনাহার চাচি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এক হাতে টর্চলাইট, অন্য হাতে আঁচলের নীচে কী যেন আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তিনি। আম্বিয়া বানু ঘর থেকে নেমে এলেন। গুলনাহার চাচিকে সালাম দিয়ে বললেন, চাচিমা আপনি? এত রাতে! কোনো সমস্যা হয়নি তো চাচি? আমার তো ভয়ে বুক হিম হয়ে আসছে। চাচাজান ভালো আছেন তো?

— আরে, এত প্রশ্ন কেন বউমা? আগে বসতে তো দেও। নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্যের চিন্তায় দেখছি অস্থির হয়ে থাকো তুমি!

— ছি ছি চাচি! আমিও যেমন! আসেন আসেন। আগে বসতে বলব কি না...

বলে আম্বিয়া বানু গুলনাহার চাচিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে বসালেন। আর চাচির মুখের দিকে তিনি কী উদ্দেশে এসেছেন, সেটা জানার জন্য উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

গুলনাহার চাচি তার আঁচলের নীচ থেকে উপরে ঢাকনা দেওয়া একটা গামলা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, বাচ্চা দুটোরে উঠাও। কিছু খাওয়াও বউ। তুমিও খাও। ক্ষুধাপেটে ঘুম আসে না, বুঝছ?

আল্লাহ যে কত মহান, তা আম্বিয়া বানু সেদিন আবার টের পেলেন। তার ঘরে সেদিন যে কিছুই নেই, একথা তিনি কাউকে বলেননি। অথচ সেদিনই বড়োবাড়ির গুলনাহার চাচি আম্বিয়া বানুর ঘরে রান্না করা খাবার নিয়ে হাজির হলেন!

আম্বিয়া বানু আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালেন। আর কেঁদে ফেললেন। বললেন, খোদার অশেষ দয়া চাচি, আল্লাহ আপনাকে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই আমার ঘরে কোনো খাবার নেই। আপনি কীভাবে বুঝলেন আমার ঘরের কথা?

গুলনাহার চাচি বললেন, হেইডা তুমার না হোনলেও চলব। এহন গ্যাদা দুইডারে উঠাও।

আম্বিয়া বানু আর কথা বাড়ালেন না। খাবার নিয়ে রাখলেন। তারপর শায়লা আর শামিলকে ডেকে ওঠালেন। বললেন, দ্যাখ, তোদের দাদিমা কত খাবার এনেছেন! তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড় মা। কই শামিল, বাপ ওঠ...

ওদেরও পেটে ক্ষুধা ছিল। ছোটো হলেও মায়ের অসহায়ত্ব ওরা বোঝে। তাই কিছুই না বলে ক চুমুক পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল শায়লা। শামিল কান্না করেছে কিছুক্ষণ। তারপর ঘুমিয়ে গিয়েছিল। খাবারের কথা শুনে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল ওরা। খাবার দেখে তাদের চোখ চকচক করে উঠল। আত্মাভরে খেলো ভাত-মাছ-তরকারি। সাথে ডিম আর লালশাক ভাজি। আম্বিয়া বানুও খেলেন। তাদের খাওয়াতে পেরে গুলনাহার চাচি পরম তৃপ্ত হলেন। তিনি যে খাবার এনেছেন, তারা খেয়েও এই তিনজনার সকালেও হয়ে যাবে।

বাড়তি ভাত-তরকারি বাসনে রাখতে বলে গুলনাহার চাচি বললেন, আর একখান কথা বউ, আমি যা বলব, না কইবা না। বলেই তিনি আম্বিয়া বানুর হাতে গুঁজে দিলেন দলামোছা করা বেশকিছু টাকা। বললেন, তুমি তো সেলাই মেশিন চালাইতে জানো। এই টাকা দিয়া একখান মেশিন কিনবা। তারপর পাড়াঘরের টুকটাক সেলাইয়ের কাজ, কাপড়চোপড় বানানির কাজ করবা। তাতে যা অল্পকিছু আয় হইব, তোমরা কষ্টমষ্ট কইরা চলতে পারবা।

আম্বিয়া বানু গুলনাহার চাচির এই মহানুভবতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কেবল তাদের এই পরিস্থিতিতে খাবারের ব্যবস্থাই করলেন না, পাশাপাশি তিনি যেন তার এই ছোট্ট সংসারটা আগামী দিনগুলোতে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থাও করে দিতে এসেছেন। আম্বিয়া বানু মুখে শুধু বললেন, কিন্তু চাচি, এতগুলো টাকা আমি কীভাবে নেব? আমি...

গুলনাহার চাচি তার কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, বলছি না কথা কইবা না? তুমার কথা না হয় বাদই দিলাম, এই গ্যাদা দুইডারে মানুষ করতে হইব না? ওদেরে ইশকুলে পাঠাইবা না? ওদের ভবিষ্যতের কথাডাও একটু ভাবো। জানি, তোমার মানসম্মানে বাঁধছে। এর জন্যি তোমারে আমি সম্মান করি। এ নিয়ে তুমি মোটেও চিন্তা কইরো না। এই টাকা এমনি এমনি দিচ্ছি নে বউ, সময়-সুযোগ বুইঝা শোধ কইরা দিও। না দিলেও কোনো দাবিদাবা নাই, বুঝলা? এখন ঘুমাও দরজা দিয়া। অনেক রাত হইছে। আমি যাই।

আম্বিয়া বানু জানেন, কোনো অবলম্বন পেলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবেন। তার সেই আত্মবিশ্বাস আছে। আর সেই রসদ না চাইতেই গুলনাহার চাচি তার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। এটা নিয়ে তিনি কখনোই হেলাফেলা করবেন না। চাচির ইচ্ছের প্রতিফলন তাকে ঘটাতেই হবে। এই ঘোর অন্ধকারে গুলনাহার চাচি বিধাতার এক অশেষ কৃপা হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে করলেন আম্বিয়া বানু। তিনি এটাও জানেন, রাত যত গভীর হয়, সকাল ততই নিকটবর্তী হয়।

বর্তমান এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ে দুটো নিয়ে তিনি একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারবেন। তেমন হলে তাকে আর কাউকে করুণার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না। চাচি যেন তার সেই ব্যবস্থাই করে দিয়ে গেলেন। সেই সুদিনের অপেক্ষায় আম্বিয়া বানু গুলনাহার চাচির চলে যাওয়া পথের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন।

— ০ —

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

ঈদের শুভেচ্ছা

রুস্তম আলী

উৎসব-উল্লাসে নেচে উঠে মন
শুভেচ্ছা জানাতে–
গোলাপ, বেলি আর কৃষ্ণচূড়ার
হয় না প্রয়োজন।

অচেনাকে চেনা মনে হয়
পৌষের সূর্যোদয়ের মতো
হৃদয়ে আনন্দে উপচে পড়া ঢেউ
মুছে নিয়ে যায় ধূলিকণা যতো।

কী যে এক আকর্ষণে
ছুটে যাই মুগ্ধ মনে
শাপলার হাটে
ঈদ গাঁয়ের মাঠে।

স্মৃতির পাতায় জমা যতো গ্লানি
মুছে যায় নিমিষে
অশ্রুসজল ছোঁয়া আবেগের ভাষা
ঈদের মাঝে খুঁজে পাই
নতুনের আশা।

ঈদের আমেজ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

ঈদের খুশি ঘরে ঘরে
চাঁদ উঠেছে ওই,
এ খুশিতে শিশুরা তাই
করছে হইচই।

হাসছে শিশু হাসছে বুড়ো
সবাই খুশি বেশ,
সবার মাঝে ছড়িয়ে গেছে
আনন্দ আবেশ।

ছোট-বড় ধনী-গরিব
সবার মুখে হাসি,
ঈদের খুশি চারদিকে
ছড়াক রাশিরাশি।

প্রতিদিন যদি ঈদটা হতো

শাহীন খান

ঈদ তো হাসিখুশি আনন্দ
কেটে যায় মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

অনাবিল সুখ নামে গোটা প্রাণেতে
মুখরিত হয়ে পড়ি ঈদ গানেতে।

চারদিকে মৌ মৌ গন্ধ আসে
শত্রুতা ভুলে গিয়ে দাঁড়াই পাশে।

নামাজেতে যাই সব টুপি মাথায়
ফেলে না তো কেউ শোন কোন ধাঁধায়।

কোলাকুলি করি সবে নামাজ শেষে
খানা খাই বাড়ি বাড়ি ভালো যে বেসে।

সেলামিটা পাই আমি, মনটা রঙিন
থাকে না তো এই বুকে ব্যথা চিনচিন!

দ্বীনহীন যতো আছে বন্ধু যে হয়
ওদেরও মনে কতো সুগন্ধি বয়!

একাকার হয়ে যাই সবার দুঃখে
মধুমাখা হাসি ঝরে মলিন মুখে।

প্রতিদিন যদি ভাই ঈদটা হতো
জীবনটা হয়ে যেত ফুলের মতো।

খুশির ঈদ

আলমগীর কবির

আজ শেষ ইফতারে খুশি ভরা মন,
আলোকিত হয়ে গেল হৃদয়ের কোণ

পাখিদের ঠোঁটে আজ এত কেন গান,
ফুলবনে এত কেন মায়ামাখা ঘ্রাণ!

আজ রাত চাঁদ রাত হাসি হাসি মুখ,
মার মুখে হাসি দেখে ভরে যায় বুক।

চল ভাই চাঁদ দেখি ডেকে বলে বোন,
একা চাঁদ দেখবো না বোন তুই শোন–
তুয়া মিম তানভীর তানজিম কই?
উঠোনের এক পাশে সে কী হইচই !

মেঘেদের ফাঁকে চাঁদ খুঁজে সারা হই,
হাত তুলে বলে বোন চাঁদ দেখো ওই–
একে একে সকলেই দেখি বাঁকা চাঁদ,
আনন্দ ঢেউ এসে ভেঙে দিলো বাঁধ।

খুশিপুরে দলবেঁধে ভেসে যাই যেন,
আমাদের এই দলে মুমু নেই কেন?

মুমু দূরে বসে আছে মুখ করে ভার,
বোন তাকে দিলো আজ জামা উপহার।
ভুলে যাই অভিমান ভুলে যাই জিদ,
রাতটুকু পোহালেই কাল হবে ঈদ!

আশীর্বাদ হয়ে এসো বৈশাখ

সামসুন্নাহার ফারুক

ভেবেছিলে বৈশাখির পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে
চণ্ডালী আক্রোশে তছনছ করে দেবে
ফাগুনের কিশলয় সবুজ বাথান
সম্ভাবনার সজল আখ্যান
নূতনের আগমনি গাথা
প্রাণোচ্ছল আমের গুটির আনন্দ হালখাতা
ভেঙেচুরে গুড়িয়ে দেবে
গেরস্তির সাজানো পালান
সংক্রান্তির শেষে আশার বসতিতে
জীবনের অনিন্দ্য আহ্বান
এমনই তো ভেবেছিলে
এত ক্রোধ এত উল্লাস এত নিষ্ঠুরতা
মানায় না তোমাকে
তাইতো প্রলয় ঠেকাতে আকাশ ভেঙে
নেমে এলো সুখের কণারা
প্রশান্তির ধারাস্নানে ভিজে গেল প্রকৃতি
ভিজে গেল বৃক্ষ লতাপাতা
হেসে উঠলো জীবনের আশ্বাস
কল্যাণের অধিষ্ঠানে মৃত্তিকার বুকে
অপরূপ মোহময়তায় পল্লবিত মায়াবী আভাস
তোমাকে ডাকছি আমি ওগো বৈশাখ
টলটলে জল বুকে বিপুল উচ্ছ্বাসে
এসে যাও এসে যাও আমার নিবাসে
ঝরিয়ে অমিয়ধারা প্রশান্তির আবেশে
আশীর্বাদ হয়ে এসো এই বাংলায়
শিকড়ের গভীরে মমতার ঠিকানায় ।

বোশেখ এলো

মিজানুর রহমান মিখুন

বোশেখ হলো নাগরদোলা,
বটের তলে আত্মভোলা,
বাউল কবির গান,
বোশেখ হলো বাঁশের বাঁশি
গ্রামজুড়ে রংবেরঙের
পুতুলনাচের ফান।

বোশেখ এলে মুখোশ পরে
বাঘ সাজে, কেউ ময়ূর গড়ে
সিংহ এঁকে গালে,
ইলিশ মাছের ঝোলের সাথে
পান্তা মরিচ নিচ্ছে পাতে
খাচ্ছে যে যার তালে তালে।

স্মরণীয় মেহেরপুর

মোল্লা আলিম

মেহেরপুর মুজিবনগর বৈদ্যনাথতলায়
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ এই জায়গায়
উনিশশত একাত্তর সতেরোই এপ্রিল এই দিন
থাকবে ইতিহাস হয়ে হবে না বিলীন।

শত্রুমুক্ত করতে হবে দেশ এইবার
অস্থায়ী সরকার প্রথম শপথ নিলো তার
যুদ্ধ-পরিচালনা ভাগ– এগারো সেক্টরে
দায়িত্ব ভার নিলো তারা যত্ন সহকারে ।

শুরু হয়েছিল যুদ্ধ ছাব্বিশে মার্চ পর
জ্বালাও-পোড়াও করল– ধ্বংস বাড়িঘর
বন্দি হয়ে মুজিব তখন পাকিস্তানে রয়
যা কিছু বলার ছিল– সাতই মার্চে কয়।

মুজিবের ভবিষ্যৎ বাণী বাঙালির
শত্রুদের অত্যাচার হয়নি বেশি স্থির
বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু থাকবে হুঁশিয়ার
শত্রু মোকাবিলায় নাও যার যা হাতিয়ার।

মুজিবের বুকে সাহস মনে ছিল বল
একদিন এই সত্যের জয় হলো সফল।

তার নাম বৈশাখ

রীনা তালুকদার

স্বর্ণরঙা পাকাধানের মাঠজুড়ে হলদিয়ার উৎসব
কাক ও তাড়ুয়া হরহামেশাই
উড়ে উড়ে লেজের আঘাতে গুচ্ছ থেকে
ঝরিয়ে দেয় কিছুটা আঁতুড়ের দিকে
তারপর একদিন রুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নামে চরাচরে
ঝুম বৃষ্টির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় শৈশব ফিরে
স্বর্ণদেবী ধান গোলায় যাবার বৃষ্টি
বংশ পরম্পরায় এভাবেই সোনার ধানে
নবান্নের এই দেশে দুর্মর স্বপ্নের থরো থরো চাষ
কাঁচা স্বপ্নগুলো সুখোচ্ছলে দুঃখবাদী গল্প বোনে
সম্বলহীন পথিকের বেশে শীতল দেব
ঘর পোড়া দুঃখকে বাড়িয়ে তোলে
ত্রাহি ত্রাহি শীর্ণকায় জরাগ্রস্ত প্রকৃতিকে
বসন্তদেব পলাশে রাঙিয়ে তোলে আমূল
মায়া-মমতায় কপোলে হাত বুলাতেই
বছর বিদেয়ের গান ওঠে কুহুতানের ভাঙা কণ্ঠে
তারপর না পাওয়ার বেদনায় একদিন
কাজলকালো চোখে মেঘের মেয়ে
শাসিয়ে যায় ছায়াছবির সবুজ শ্যামলীকে
অচেনার বেশে এলোকেশে ধরাধামে
যে আসে আউল-বাউল বাতাসে
তার নাম বৈশাখ; তার নামই বৈশাখ।

আমার আছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ

আনসার আনন্দ

আমার তো আছে
বাহান্নর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
আমার তো আছে
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ
আমার তো আছে
বিজয় দিবস গর্বের লাল-সবুজের পতাকা
আমার তো আছে
রক্তমাখা বর্ণমালার মিছিলে মিছিলে
রফিক, শফিক, বরকত, সালাম, জব্বার আরো কত নাম–
আমার তো আছে
নব বৈশাখ, নবান্ন আনন্দ উৎসব মঙ্গল শোভাযাত্রা
আমার তো আছে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
আছে দোয়েলের ঘুম ভাঙানো গান
দূর থেকে ভেসে আসা মোয়াজ্জিনের আজান।

বৈশাখি

আবদুল মজিদ

এসো হে বৈশাখ
নতুন অতিথি
প্রাপ্তির বারতা নিয়ে
মুছে যাক গ্লানি।
জোয়ারে উছলায় সাগর
যৌবন নদীতে
আকাশে কালো মেঘ
দমকা হাওয়া
শনশন বাতাস
এক পশলা বৃষ্টি
রুদ্রমূর্তিতে লণ্ডভণ্ড
কালবৈশাখি।
প্রকৃতিতে লেগেছে সাড়া
গ্রীষ্মের খরতাপ, উত্তাপ
চৈত্রের স্বরূপ
আপাতত নেই বৃষ্টির সম্ভাবনা
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
তাপদাহ, লঘুচাপ
শুষ্ক পৃথিবী
পুষ্প পল্লবে
বর্ষার আগমনি বৈশাখি
করেছে সিক্ত ভূমি
উর্বর পৃথিবী।

মুজিব

আতিক আজিজ

মুজিব নামের অন্তরালে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশ
লুকিয়ে আছে স্বাধীনতা তোমার আমার স্বপ্নাবেশ।
মুজিব নামের সূর্যালোকে ঝলসে আছে ইতিহাস
ঝলসে আছে জাতীয়তা জনগণের অভিলাষ।
মুজিব নামের সংকীর্তনে সংস্কৃতির স্নিগ্ধরূপ
জ্বলছে নিতুই ঘরে ঘরে চিরকালের গন্ধ-ধূপ।
মুজিব নামের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী শোষক দল
নিঃস্বরা সব উদ্দীপিত বুকে নিয়ে নতুন বল।
মুজিব নামের উচ্চারণে উচ্চকিত সবার মন
মুজিব তোমার মুজিব আমার মুজিব জাতির পরম ধন।
মুজিব নামের সান্ত্বনাতে ভুলতে পারি সকল দুখ
আবহমান বাংলাদেশে খুঁজে ফিরি শান্তিসুখ।

বৈশাখি মেলা

আতিক রহমান

বটের ছায়ায় তটের কায়ায়
বসে বৈশাখি মেলা
আদর ও প্রিয় মেলাতে যাবেই
বাদ দিয়ে সব খেলা।
আজকে ওরা তো মেলাতে কাটাবে
সারাটা বিকেলবেলা।
বই খাতা ওরা বন্ধ করেছে
বন্ধ করেছে পাঠ,
মেলায় পৌঁছতে পেরোতে হবেই
তিনশ' ফসলি মাঠ!
দুপুরেই তাই জামা পরে ওরা
হয়ে আছে ফিটফাট!
যাচ্ছে মেলায় আদর ও প্রিয়
বাবাকে নিচ্ছে সাথে,
বৈশাখি গান গাইছে-হাঁটছে
হাত রেখে ওরা হাতে।
একটু তাড়া যে-বেলা থাকতেই
বাড়ি ফেরা যায় যাতে!
ধান কাউনের খাল পেরোলেই
মনটা সবার নাচে,
ওই দেখা যায় বৈশাখি মেলা
হাতছানি দেয় কাছে–
মেলার ভেতর ঢুকলো সবাই
দেখছে কতো কী আছে!
মেলা দেখে ওরা ভরে নিলো মন
জুড়িয়েছে চোখ-পাতা,
মেলাতে মানুষ এক হয়ে যেনো–
হয়েছে নকশিকাঁথা!
মেলা মানুষের মহামিলনের
মমতায় হয় গাঁথা!

গ্রীষ্মের কবিতা

খান চমন-ই-এলাহি

বৈশাখ এবং তুমি সমান্তরাল হাঁটো
আমার উৎসবের পথ ধরে
মাটি কিংবা কাঠফাটা রোদের শরীর ভেঙে
নদীর জোয়ার কিংবা যৌবনের উচ্ছ্বাসে।

আমি কোনো পরিযায়ী পাখি নই, তবু তোমার
লালপাড়ে সাদাশাড়ি কপালের টিপ
বেণি কিংবা খোপা গোঁজা গোলাপ, বেলি, বাহারি ফুল
নববর্ষে বন্দনার সাথে কৃষ্ণ অন্তরে বাজায় বাঁশি।
গ্রীষ্মের দাবদাহ বলে কিছু নেই, ওসব প্রকৃতি–
ঈশান কোণের মেঘ, ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব, রংধনু
আমার কাছে সহজাত স্বপ্ন হয়ে ওঠে
নিরাবরণ তোমার দেহবল্লরী আল্পনা আঁকায়।

চৈত্র সংক্রান্তির শেষ সন্ধ্যা নীড় মুখো পাখির মতো
আমার স্বপ্নরা উড়ে উড়ে যায় শুভ হালখাতা উৎসবে
ফসলের গানে, রমনার বটতলা, হাটখোলা, কালিমন্দির, গঞ্জের মেলা
এবং আবহমান বাংলার মাটি ও কৃষকের কাছে।

অমীমাংসিত

মাশ্‌হুদা মাধবী

কিছু ভালো লাগে না ইদানীং আমার,
ফুল, বনতল, সবুজ পাতার হাহাকার
ক্ষয়ে যাওয়া ভীরু চাঁদ ম্লান জোছনার
নিভু নিভু আলো আবছা কোথাকার।

শ্যামল গ্রামাঞ্চল পটভূমি স্থবির প্রাচীন
চিরহরিৎ বনভূমি বিস্তার যেন ছাড়াছাড়া
কাঁচপোকা, জোনাকি দীপ আলোহীন
বুঝি ভয়ে জড়সড়? নেই নাড়াচাড়া।

সবুজ তৃণভূমি আকিঞ্চন প্রীতি কার?
তার? তোমার? শুধুই একাকী আমার?
কিছু তো মীমাংসা হওয়া দরকার।
অতি প্রিয় যাবতীয় তবে ছিল কার?

আছে কার? শুদ্ধ ভালোবাসার?
নাকি অচেনা খেলা, প্রতিযোগিতার?
নাই উত্তর, গরজ, বালাই পড়েছে কার!
প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কে-ই বা কার?
বাস্তব যা– সকলে যার যার তার তার।

বন্ধু

তারিকুল আমিন

সঠিক পথে চলতে গেলে
আসবে অনেক বাধা,
দুটি চোখে দেখবে তখন
শুধুই গোলকধাঁধা ।

পথের মাঝে থাকবে কত
পাহাড় নদী বন,
রাখতে হবে বন্ধু তোমায়
শক্ত করেই মন ।

সব কিছুকে তুচ্ছ করেই
চলতে হবে পথ,
তবেই হবে সুখী জীবন
সুখী ভবিষ্যৎ।

হোক সুমতি

ইকবাল কবীর রনজু

দখল দূষণে ধুকছে নদনদী
নাব্যতা সংকটে ধুধু বালুচর
একে একে সব নদী মরে যায় যদি
জল যাবে কোন পথে? উঁচু কর স্বর
বায়ুতে কার্বন ক্রমাগত বাড়ছে
জলবায়ু সচেতনে মানুষ জাগো রে
তাপের বৃদ্ধি তোমার নজর কাড়ছে?
বরফ গলা পানি ধরবে সাগরে?

বিচিত্র প্রাণের ধারক যে প্রকৃতি
তার সাথে কেন অসভ্য আচরণ?
খাল-বিল-হাওর বনের ক্ষতি
করো নাকো অকারণ পাহাড় কর্তন
জলবায়ু রক্ষায় হোক সুমতি
অপত্যের সুখ করো না হরণ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ২৫শে মার্চ ২০২৪ ঢাকায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে এসেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর এজন্যই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। জাতির পিতার ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই মার্চ রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গ্রামের কাদা জল, মেঠোপথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশবিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরিব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র ওপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেপ্তার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২-এর 'ভাষা আন্দোলন', '৫৪-এর 'যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন', '৫৮-এর 'সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন', '৬৫-এর '৬-দফা', '৬৯-এর 'গণ-অভ্যুত্থান', '৭০-এর 'নির্বাচন' সহ বাঙালি মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনও শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি।

গণহত্যা দিবস ২০২৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, আজ ভয়াল ২৫শে মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারা দেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে কাপুরুষের দল সেদিন নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক। ২৫শে মার্চ রাষ্ট্রপতি তাঁর এক বাণীতে এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারা দেশে। হায়েনার দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানাসহ (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চালায়। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান। তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখীসমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য মোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল ও মেট্রোরেল দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ। ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রপতি তাঁর এক বাণীতে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট সকলকে ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কৌশল প্রণয়ন করতে বলেন। ২৮শে মার্চ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বর্তমান সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ২য় সভা এবং চলতি অর্থবছরের (২০১৮) অষ্টম একনেক সভায় সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব সত্যজিৎ কর্মকার জানান, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হওয়ার বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে সমন্বয়ের কোনো সমস্যা নেই। এটি কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি সার্বিক সমস্যা। এলডিসি থেকে উত্তরণে কিছু সম্ভাবনার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এসময় পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, বৈঠকে মোট ৮,৪২৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ের মোট ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ৭,৯৩৯.৮৭ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আসবে এবং বাকি ৪৮৫.৬৪ কোটি টাকা প্রকল্প সহায়তা হিসেবে আসবে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অটিজমের শিকার ব্যক্তিদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সকলের সঙ্গে অটিজম ও প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আরও বেশি প্রযুক্তিবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে তিনি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্টকে আহ্বান জানান। ২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রণীত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) দেশের ১৪টি স্থানে প্রকল্প হিসেবে ১৪টি 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি 'চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে ট্রাস্ট যৌথভাবে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' বাস্তবায়ন করছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকার এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০৩০' প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। একইসঙ্গে শিক্ষকদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অমৌখিক যোগাযোগের জন্য 'বলতে চাই' এবং অটিজম বিষয়ক প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা শনাক্তকরণের জন্য 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক দুটি অ্যাপস তৈরি করেছে।

আসুন দেশের সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৪তম দিবসে আসুন, সকল কুট-কৌশল-ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই। ২৫শে মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় দিবস ২০২৪'-এর প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছরে তাঁর সরকার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নারীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪' উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

ক্ষমতায়ন এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ দেশের আর্থসামাজিক খাতে অভূতপূর্ব এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে 'উদীয়মান অর্থনীতির দেশে' রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে।

২০২৪ সালে স্বাধীনতার ৫৩তম বার্ষিকীতে দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেন, আমরা দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা প্রমাণ করেছি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও দেশকে আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ায় তাঁর সরকারের সাফল্যের খণ্ডচিত্রও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে এবং হতদরিদ্রের হার ২৫.১ হতে ৫.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৯৩ লাখ মেট্রিক টন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পদ্মা সেতু, ঢাকায় মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল, বিভাগীয় শহরগুলোর সঙ্গে চার বা তারও বেশি লেনের মহাসড়ক চালু, ইত্যাদি অবকাঠামো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। দেশের শতভাগ এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

এছাড়া চলমান রমজানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনগণের কল্যাণে তাঁর সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, টিসিবি প্রথম পর্যায়ে সারা দেশের ১ কোটি কার্ডধারী পরিবারের জন্য সুলভমূল্যে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি এবং ছোলা– এই ৫টি পণ্য বিতরণ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা ও আশপাশের এলাকার কার্ডধারী পরিবারের জন্য চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা ও খেজুর– এই ৬টি পণ্য বিতরণ করছে। ঈদ উপলক্ষে সারা দেশের ১ কোটি ৬২ হাজার ৮০০ পরিবারের জন্য সরকার এক লাখ ৬২৮ মেট্রিক টন চালের বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতি পরিবার বিনামূল্যে ১০ কেজি করে চাল পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য দেশের যে উন্নয়ন সাধন করেছি তা থেকে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। যে বাংলাদেশ হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

৭ই মার্চের ভাষণ ছিল দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি সুস্পষ্ট বার্তা

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। ৭ই মার্চ রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে দুই ধরনের উপাদান ছিল। একটি হচ্ছে অস্পষ্টতা, আরেকটি হচ্ছে স্পষ্টতা। এ ভাষণে দুই ধরনের বার্তা ছিল। যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সন্দিহান ছিল, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল, তারা ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে দ্বিধান্বিত হয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্য ভাষণটি ছিল অস্পষ্ট। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল, তারা পরিষ্কার বার্তা পেয়েছিল, কী বলা হচ্ছে, কী করতে হবে। যারা অবস্থানগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল এবং সুস্পষ্ট বার্তাটি পায়নি, তারাই ভাষণটি নিয়ে পরবর্তীতে অনেক ধরনের বিতর্কিত কথা বলার চেষ্টা করেছে।

ছবি– বাসস

তিনি বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে যে বার্তা বঙ্গবন্ধু দিতে চেয়েছেন, এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ সেটা সুস্পষ্টভাবে বুঝেছিল। যারা বোঝার, তারা বার্তা পেয়েছিল এবং তারা সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল। স্বাধীনতার প্রতিটি ধাপে ধাপে সে প্রস্তুতি আমরা দেখেছি। যাদের সাহসী উদ্যোগের ফলে ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম দেখতে ও শুনতে পেয়েছে, তাদের এ সময় ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. নিজামূল কবীর এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা) মোহাম্মদ আলী সরকার। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনিবন্ধিত অনলাইন পোর্টালকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, অনিবন্ধিত অনলাইন পোর্টালকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে। ৫ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৪'-এর তৃতীয় দিনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্য অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

জেলা প্রশাসকদের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কী আলোচনা হয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা যেমন বলেন গোটা বাংলাদেশে গণমাধ্যমে একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা দরকার, সাংবাদিকদের ন্যূনতম একটি যোগ্যতা থাকা দরকার, গণমাধ্যমকর্মী আইন শিগগিরই করে ফেলা দরকার, জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকেও একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। সাংবাদিকসহ সর্বস্তরে সবার দাবি যেহেতু একই রকম, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এ দাবিগুলোর সাথে একমত পোষণ করে সে জায়গায় কাজ করব।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনলাইনে কতগুলো অনিবন্ধিত পোর্টাল আছে, যে পোর্টালগুলো বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ায় সেগুলোকে শৃঙ্খলায় আনার একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে। যেসব অনলাইন পোর্টাল পেশাদার, রেজিস্টার্ড (নিবন্ধিত) এবং আইনগতভাবে সিদ্ধ, সেগুলোই থাকবে এবং চলবে। যাতে করে সবকিছুর মধ্যে একটা জবাবদিহি এবং শৃঙ্খলা থাকে। যেটা সাংবাদিকরাও চান। জেলা প্রশাসকরা এক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারেন–সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জেলা প্রশাসকরা তৃণমূলের সাথে সম্পৃক্ত। তারা আমাদেরকে তথ্য পাঠাতে পারেন। প্রান্তিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেগুলো নিয়ে তারা অ্যাকশনে যেতে পারেন। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, জেলা প্রশাসকরা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে আরও কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। ক্যাবল অপারেটররা অনেক কিছু তাদের মতো কনটেন্ট দিয়ে দেয়, দর্শক-শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। সেই কন্টেন্টগুলো আসলে সঠিক কি না, ক্লিন ফিডের যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, এ বিষয়গুলো আমরা জেলা প্রশাসকদের দেখার জন্য বলেছি।

সাংবাদিক যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করা হবে

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, তথ্য চাইতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক যাতে হেনস্থা বা হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করা হবে। ১৮ই মার্চ রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক যেন কোনো ধরনের হয়রানি বা ঝুঁকির মুখে না পড়ে। তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনভাবে গণমাধ্যম তাদের কাজ করবে। কর্তৃপক্ষকে, সরকারকে প্রশ্ন করবে, সমালোচনা করবে, এরকম একটি সমাজ ব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে চাই। এর বাইরে বঙ্গবন্ধুকন্যার সরকার চিন্তা করে না।

এসময় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলয় তৈরির জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রয়াসের অংশ হিসেবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কল্যাণ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর কন্যা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা অন্য কোনো কিছু দেখেননি, শুধু প্রয়োজন দেখেছেন, মানুষ দেখেছেন, সাংবাদিককে দেখেছেন। কে কোন দলের, কার পক্ষে ছিলেন, বিপক্ষে ছিলেন এগুলো চিন্তা করেননি এবং তার ভিত্তিতে পেশাদারিত্বের সাথে সাংবাদিকদের অনুদানের কাজটি করা হয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে প্রয়োজন এবং পেশা বিবেচনায় সরকার সাংবাদিকদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। নবম ওয়েজ বোর্ডের বকেয়া পাওনা দ্রুততার সাথে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সব গণমাধ্যমের মালিকপক্ষের প্রতি এ সময় আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সরকার সাংবাদিকবান্ধব ও গণমাধ্যমবান্ধব। আমরা গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চাই এবং পেশাদার সাংবাদিকদের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। সেই নিরিখে সাংবাদিকদের কল্যাণের স্বার্থে সরকার তার জায়গায় কাজ করছে। বেসরকারি খাতকেও অনুরোধ করতে চাই, তারাও বিশেষ করে মালিকপক্ষ যেন সহানুভূতি ও পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, যারা সমাজে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপতথ্য ছড়ায়, তাদেরকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করব। কারণ অপতথ্য গণতন্ত্রের জন্য হুমকি, সুস্থ সাংবাদিকতা ও সুস্থ গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার সবসময় পাশে থাকবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাংলাদেশের জমি উদ্ধার

দীর্ঘ ৭০ বছর ভারতের দখলে থাকার পর ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার জগদল ও বালিয়াডাঙ্গী বেউরঝাড়ি সীমান্তবর্তী ৯১ বিঘা জমি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ৯ই এপ্রিল ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। উদ্ধার করা জমিতে সাদা পতাকা (নিশানা) টানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। জমিগুলো উদ্ধারে প্রায় ১ মাস আগে কাজ শুরু করে বিজিবি।

বাহিনীটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ-ভারতের সার্ভে বিভাগের যৌথ জরিপের মাধ্যমে ভারতের দখলে থাকা জগদল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রায় ১৫ বিঘা জমি এবং বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রায় ৭৬ বিঘা জমি (মোট ৯১ বিঘা) উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশের অনুকূলে প্রাপ্ত জমির মধ্যে ৭৭ বিঘা আবাদি জমি, ১১ বিঘা চা বাগান ও ৩ বিঘা নদীর চর রয়েছে।

ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন স্ট্রিপ ম্যাপ পর্যালোচনা করে পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল জমিগুলো বাংলাদেশের। পরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জমিগুলো বাংলাদেশের বলে বিজিবির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ ও ৭ই মার্চ বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ জগদল এবং বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে যৌথ জরিপ ও পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫ বিঘা ভারতের দখলে থাকা জমি বাংলাদেশের অনুকূলে পাওয়া যায়। অপরদিকে প্রায় ৭ দশমিক ৫ বিঘা বাংলাদেশের দখলে থাকা জমি ভারত পায়।

ঈদে টোল আদায়ে রেকর্ড

এবারের ঈদ ও বাংলা নববর্ষের ছুটিতে (৮ থেকে ১৪ই এপ্রিল) পদ্মা সেতু হয়ে ২ লাখ ১৩ হাজার ২৭৯টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। সেতুর মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে টোল আদায় হয়েছে ২১ কোটি ৪৭ লাখ ৭৪ হাজার ৫৫০ টাকা।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, মাওয়া প্রান্ত দিয়ে ৮ই এপ্রিল ২০ হাজার ৮৫১টি, ৯ই এপ্রিল ৩০ হাজার ৩৩০টি, ১০ই এপ্রিল ১৭ হাজার ৭০৫টি, ১১ই এপ্রিল ১১ হাজার ১৯৪টি, ১২ই এপ্রিল ১৫ হাজার ৮৮৩টি এবং ১৩ই এপ্রিল ১২ হাজার ৮৯৬টি ও ১৪ই এপ্রিল ১১ হাজার ৬২৫টি যানবাহন পদ্মা সেতু পার হয়েছে। এতে এ প্রান্ত দিয়ে এ সাত দিনে টোল আদায় হয়েছে ১১ কোটি ২৬ লাখ ৭৯ হাজার ৯৫০ টাকা। জাজিরা প্রান্ত দিয়ে সাত দিনে যথাক্রমে ১০ হাজার ৯৪৯টি, ১৪ হাজার ৮৭৪টি, ৮ হাজার ৫১০টি, ৭ হাজার ৪৬৫টি, ১২ হাজার ১০০টি এবং ১৫ হাজার ৫৯৬টি ও ২৩ হাজার ৩০১টি যানবাহন পদ্মা সেতু পার হয়েছে। এতে এ প্রান্তে টোল আদায় হয়েছে মোট ১০ কোটি ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৬০০ টাকা।

সেতু বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বছর ঈদুল ফিতরের সময় টোল আদায় হয়েছিল ১৪ কোটি ৬১ লাখ ৬৬ হাজার ৫৫০ টাকা। সেতু কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক আমিরুল হায়দার চৌধুরী বলেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকে এক মিনিটের জন্য সেতুতে যান পারাপার বন্ধ হয়নি। নির্বিঘ্নে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষ যাতায়াত করতে পারছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু দৃশ্যমান

সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর আরেক সমৃদ্ধির স্মারক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু এখন পুরোটাই দৃশ্যমান। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে খুলে দেওয়া হবে এই রেলসেতুটি। যমুনার বুকে দাঁড়িয়ে দেশের সমৃদ্ধিকে যেন জানান দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু। বঙ্গবন্ধু সেতুর ৩শ' মিটার উত্তর পাশেই নির্মিত হচ্ছে ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলওয়ে সেতুটি।

জাপানের জাইকা ও সরকারের যৌথ সহযোগিতায় ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২০ সালের ২৯শে নভেম্বর শুরু হয় রেলসেতুর কাজ। টাঙ্গাইল-সিরাজগঞ্জ দুই ভাগে বিভক্ত করে করা সেতুর কাজটি এখন শেষ পর্যায়ে। ৫০টি পায়ার নির্মাণের পর ৪৯ নম্বর স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে এ সেতু এখন দৃশ্যমান। রেলসেতুর অন্যান্য কাজ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হলে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে খুলে দেওয়া হতে পারে জানালেন প্রকল্প পরিচালক।

১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর পর ঢাকার সাথে উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রেল যোগাযোগ শুরু হয়। ২০০৮ সালে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু সেতুতে ফাটলের কারণে কমিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনের গতি। বর্তমানে ঘণ্টায় মাত্র ২০ কিলোমিটার গতিতে প্রতিদিন ৩৮টি ট্রেন পারাপার করা হচ্ছে পুরোনো রেলসেতু দিয়ে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডাকঘরকে ব্যাংকিং সেবার সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, শতাব্দী প্রাচীন ডাক আইন পরিবর্তনসহ ডাকঘরের বিশাল অবকাঠামো, সুবিস্তীর্ণ জনপদ ও জনবলকে কাজে লাগাতে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। ৩০শে মার্চ টুঙ্গিপাড়া প্রধান ডাকঘর, কোটালীপাড়া উপজেলা ডাকঘর, রংপুরের পীরগঞ্জ ডাকঘর এবং প্রধান ডাকঘর যশোরকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে রূপান্তর উদ্বোধন উপলক্ষে স্মার্ট প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট অব পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত ডাকসেবার পাশাপাশি দেশের দুর্গম এলাকাসহ প্রতিটি গ্রামের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্মার্ট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। এর ফলে একদিকে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস পাবে, অন্যদিকে গ্রামে বসেই ৩২৫টিরও বেশি ই-গভর্নমেন্ট সেবা, ই-কমার্স ও ব্যাংকিং সেবা পাবে। এই লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রতিটি ডাকঘরকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে রূপান্তরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনায় প্রচলিত ডাক ব্যবস্থাকে স্মার্ট ডাক ব্যবস্থায় রূপান্তর কর্মসূচির অংশ হিসেবে চারটি ডাকঘরের স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট উদ্বোধন করা হচ্ছে। এর আগে গত ১৯শে মার্চ খুলনার কয়রা ডাকঘরকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে রূপান্তর করা হয়। আগামী মে মাসের মধ্যে ৫০০টি ডাকঘর এবং পর্যায়ক্রমে দেশের বিদ্যমান ৯৯৭০টি ডাকঘরকে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্টে রূপান্তর করা হবে।

'জীবন' কানেক্টিভিটি হবে বিটিসিএলের লাইফ লাইন

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'জীবন' কানেক্টিভিটি হবে বিটিসিএলের লাইফ লাইন। এই একটি প্যাকেজ যা দিয়ে আমরা বিটিসিএলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারব। উচ্চগতিসম্পন্ন এই প্যাকেজ সারা দেশে ৪ লাখ মানুষের মাঝে দেওয়া হবে। মাত্র ৩০০ টাকায় ৬ এমবিপিএস, ৫০০ টাকায় ১০ এমবিপিএস, এক হাজার টাকায় ২০ এমবিপিএস গতিসম্পন্ন লাইন গ্রাহকদের মাঝে দেওয়া হবে। এরপরও বিটিসিএল লাভের মুখ না দেখলে ভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেবার মান বাড়ালে বিটিসিএলের প্রতি বছর দেড়শ' থেকে দুইশ' কোটি লোকসান বন্ধ হবে। ১১ই মার্চ মেহেরপুর বিটিসিএলের কার্যালয়ে উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট জীবন কানেক্টিভিটি উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, টেলিটকের ৪৮ লাখ গ্রাহকের যে সিম অ্যাক্টিভিটি আছে তাদের সমস্যা দূর করার জন্য জাদুকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলালিংকের সঙ্গে অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে উচ্চগতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক পাচ্ছি। সেখানে ইন্টারনেট ভালো পাচ্ছি, ভয়েজ কলও ভালো হচ্ছে। টেলিটকের নেটওয়ার্ক না থাকলেও আমরা সব ধরনের সুবিধা এখান থেকে পাচ্ছি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথম-তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাময়িক পরীক্ষা হবে না

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অ্যাপসের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। থাকছে না প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। ২১শে মার্চ ২০২৪ সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব ফরিদ আহাম্মদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ তথ্য জানান।

সচিব বলেন, শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করার

২১শে মার্চ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ

লক্ষ্যে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে দ্রুত মূল্যায়ন করতে পারে এজন্য এনসিটিবি অ্যাপস করেছে। সচিব আরও বলেন, মূল কথা হলো প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক– এসব আর থাকবে না। মূল্যায়নের পদ্ধতি গতানুগতিক হবে না। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী থাকবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

উল্লেখ্য, গত ২০২৩ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ বছর দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে চালু হয়েছে এই শিক্ষাক্রম। এরই আলোকে ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাস্তবায়িত হবে নতুন শিক্ষাক্রম।

এনটিআরসিএ-এর ৯৬ হাজার ৭৩৬ পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ৯৬ হাজার ৭৩৬ পদে শিক্ষক নিয়োগের ৫ম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৩১শে মার্চ ২০২৪ এনটিআরসিএ-এর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান সদস্য (যুগ্মসচিব) মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত এ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কুল ও কলেজে ৪৩ হাজার ২৮৬টি এবং মাদ্রাসা, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ৫৩ হাজার ৪৫০টি পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট বিষয় পদ ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নিবন্ধনধারীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ২০২৪ সালের ১লা জানুয়ারি ৩৫ বছর বা তার কম হতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারী নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী একই পর্যায়ে (স্কুল/কলেজ) একটি মাত্র আবেদন করতে পারবে। প্রার্থী শূন্য পদের তালিকা থেকে তার আবেদনে ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পছন্দ দিতে পারবেন। ই-অ্যাপ্লিকেশন পূরণ ও ফি জমা প্রদান শুরু হবে ১৭ই এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে। অন্যদিকে ই-অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ৯ই মে রাত ১২টা পর্যন্ত।

নড়াইলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে নড়াইলে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মার্ট উপহার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। ১১ই মার্চ ২০২৪ নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে নড়াইল জেলা প্রশাসন ও তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'হার পাওয়ার' প্রকল্পের আওতায় ২৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী। হার পাওয়ার প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক নিলুফা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করা হয়।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

পাঁচ নারী পেলেন জয়িতা সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচ নারীকে দেওয়া হয়েছে জয়িতা সম্মাননা ২০২৩। তাদের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৮ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঁচ জয়িতাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। পুরস্কার পাওয়া পাঁচ জয়িতা হলেন– ময়মনসিংহের আনার কলি, রাজশাহীর কল্যাণী মিনজি, সিলেটের কমলী রবি দাশ, বরগুনার জাহানারা বেগম ও খুলনার পাখি দত্ত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ৮ই মার্চ ২০২৪ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'সেরা জয়িতা পুরস্কার ২০২৩' প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন –পিআইডি

কুমিল্লা সিটি পেল প্রথম নারী মেয়র

কুমিল্লা সিটি করপোরেশন (কুসিক) প্রথমবারের মতো একজন নারী মেয়র পেল। তার নাম ডা. তাহসিন বাহার সূচনা। ৯ই মার্চ অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. তাহসিন বাহার সূচনা কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের মেয়ে। সূচনা প্রথমবারের মতো সিটি নির্বাচনে প্রার্থী হন। উল্লেখ্য, গত বছরের

১৩ই ডিসেম্বর মেয়র আরফানুল হক রিফাত মৃত্যুবরণ করলে পদটি শূন্য হয়।

প্রথমবারের মতো নারী মেয়র পেল মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ পৌরসভায় ৯ই মার্চ অনুষ্ঠিত মেয়র পদে উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন চৌধুরী ফাহরিয়া আফরিন। মুন্সিগঞ্জ পৌরসভায় তিনিই প্রথম নারী মেয়র। চৌধুরী ফাহরিয়া আফরিন মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সালের স্ত্রী। গত সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পৌরসভার মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করেন মোহাম্মদ ফয়সাল। এতে মেয়র পদটি শূন্য হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি এ পৌরসভা সৃষ্টি হয়। এটি ক শ্রেণির পৌরসভা। ৫২ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম একজন নারী মেয়র পেল পৌরবাসী।

যুক্তরাষ্ট্রে 'সাহসী নারী' পুরস্কার পেলেন ফাওজিয়া করিম

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাওজিয়া করিম ফিরোজকে ২০২৪ সালের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' পুরস্কারে ভূষিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ৫ই মার্চ হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ফাওজিয়া করিমের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, আইনজীবী ফাওজিয়া করিম তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছেন। ফাওজিয়া করিম বর্তমানে তার নিজস্ব আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সেই সঙ্গে তিনি ফাউন্ডেশন ফর ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এফএলএডি) চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফাওজিয়া করিম। অ্যাসিড সারভাইভারস ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি তিনি।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তঃনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন

লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেন ১২ই মার্চ বুড়িমারী রেলওয়ে স্টেশনে ফিতা কেটে আন্তঃনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে বুড়িমারী রেলওয়ে স্টেশনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য নুরুজ্জামান আহমেদ, লালমনিরহাট-৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান, বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদার, লালমনিরহাটের জেলা

প্রশাসক মোহাম্মদ উল্যাহ ও পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, বুড়িমারী এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ৮০৯) ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে ৮টায় ছেড়ে যাবে এবং লালমনিরহাট স্টেশনে পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে। এরপর ট্রেনটি লালমনিরহাট স্টেশনে লালমনিরহাট-বুড়িমারী-লালমনিরহাট রুটের ৪৫৫ নম্বর ট্রেনের সঙ্গে যুক্ত হবে। ট্রেনটি ৬টা ৫০ মিনিটে লালমনিরহাট স্টেশন থেকে ছেড়ে বুড়িমারী রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। অন্যদিকে বুড়িমারী কমিউটার (৪) ট্রেনটি বুড়িমারী স্টেশন থেকে সন্ধ্যা ৬টায় ছেড়ে লালমনিরহাট স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ৮টা ২৫ মিনিটে। লালমনিরহাট স্টেশনে ট্রেনটি যুক্ত হবে বুড়িমারী এক্সপ্রেস (৮১০) ট্রেনের সঙ্গে। ট্রেনটি লালমনিরহাট স্টেশন ত্যাগ করবে রাত ৯টা ১০ মিনিটে এবং ঢাকায় পৌঁছাবে সকাল ৭টায়। বুড়িমারী এক্সপ্রেসের ৮১০ নম্বর ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধের দিন সোমবার। অন্যদিকে বুড়িমারী এক্সপ্রেসের ৮০৯ নম্বর ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধের দিন মঙ্গলবার।

উল্লেখ্য, বুড়িমারী রেলস্টেশনে ওয়াশপিট নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত লালমনিরহাট রেলস্টেশন থেকে বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।

ট্রেনে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকার সবধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে

রেলপথমন্ত্রী মো. জিল্লুল হাকিম বলেন, আসন্ন ঈদুল ফিতরে ঘরমুখো মানুষের ট্রেনে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকার সবধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। ৩রা এপ্রিল রাজধানীর ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরে যাত্রীরা ট্রেনে করে নিরাপদে বাড়ি যেতে পারবে। এবার ঈদে সকল টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হয়েছে। যারা অনলাইনে টিকিট নিতে পারেননি তাদের জন্য স্ট্যান্ডিং টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকিট তদারকি করতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চত করতে রেলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক ও তৎপর থাকতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন গন্তব্যে যাতে সময় মতো ট্রেন চলাচল করে সেজন্যও আগে থেকেই

নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিরতি যাত্রাও যাতে নিরাপদ ও আরামদায়ক হয় সে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন এবং মতবিনিময়কালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর এবং ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক সর্দার সাহাদাত আলীসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ফুল-ফল রপ্তানিতে বাজিমাত

চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশের রপ্তানি বেড়েছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৫ শতাংশ। এ সময়ে ফুল ও ফলের রপ্তানি বেড়েছে প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। সাত মাসে এ পণ্যগুলোর রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২ হাজার ৭১১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৯১২ কোটি টাকার পণ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

বিদেশে যাচ্ছে রংপুরের ২০ ধরনের কৃষিপণ্য

রংপুর বিভাগের বিশেষ করে রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা জেলার চরাঞ্চলে বছরে ২০ ধরনের ফসল উৎপাদন হচ্ছে। শ্রীলংকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে চরের ফসল রপ্তানি হচ্ছে। এতে এ অঞ্চলের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির চাকা গতিশীল হচ্ছে। ফসল বিদেশে রপ্তানি করে চরের কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

রংপুর ও লালমনিরহাটের চরে উৎপাদিত মিষ্টিকুমড়ো রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়ায়। আর গাইবান্ধার চরাঞ্চলের মিষ্টি আলু যাচ্ছে জাপানে। এখানকার কৃষকরা এখন আধুনিক চাষাবাদের মধ্য দিয়ে ফসল ফলাচ্ছেন। কৃষকরা বলছেন, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা জেলার চরের জমিতে ভালো ফসল উৎপাদন হয়। এখানকার শাকসবজিতে কীটনাশক দিতে হয় না। তাদের ভাষ্যমতে অনেক পোকামাকড় চরের জমি বেশি উত্তাপ ও শুষ্ক থাকায় বসবাস করতে পারে না। তাই তারা কীটনাশক ব্যবহার করেন না। সেজন্য দেশে চরের জমির ফসলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

চরে এখন ভুট্টা, আলু, মিষ্টিকুমড়ো, শসা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, তিশি, তিল, ধানসহ ২০ রকমের ফসল উৎপাদন হচ্ছে। কৃষি গবেষণার এক তথ্যে জানা গেছে, দেশে ৩২ জেলার ১০০ উপজেলার চরে এক কোটি মানুষ বসবাস করেন। এর মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে ১০ লাখ মানুষের বসবাস। বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রায় ৬শ' চরের এক লাখ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফসল। শুধু দেশীয় চাহিদাই নয়, চরের উৎপাদিত ফসল জায়গা করে নিয়েছে বিশ্ব বাজারেও।

বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার ফসল উৎপাদন হচ্ছে উত্তরের চরগুলোতে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভাগের বিভিন্ন চর থেকে উৎপাদিত প্রায় ১৫ হাজার টন মিষ্টিকুমড়ো, আলু ও মিষ্টি আলু রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, জাপান ও ভুটানে।

প্রতিবেদন: মো.জামাল উদ্দিন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

নড়াইলে বিনামূল্যে পাট বীজ পাচ্ছেন ১২ হাজার কৃষক

নড়াইল জেলার ৩ উপজেলায় বিনামূল্যে পাটের বীজ পাচ্ছেন ১২ হাজার কৃষক। চলতি মৌসুমে (২০২৩-২০২৪) সোনালি আঁশ পাটের আবাদ বৃদ্ধিতে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পাটের বীজ দেওয়া হচ্ছে। একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে আবাদের জন্য বিজেআরআই তোষা-৮ জাতের ১ কেজি বীজ পাবেন বলে জানান জেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিপু মজুমদার।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় নড়াইল সদর উপজেলায় ৪ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে, লোহাগড়া উপজেলায় ৫ হাজার ৫শ' ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে এবং কালিয়া উপজেলায় ২ হাজার ৫শ' ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে প্রণোদনার পাট বীজ দেওয়া হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নড়াইলের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুজ্জামান ২৩শে মার্চ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, পাটের আবাদ বৃদ্ধিতে সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকদের পাশে থেকে সব ধরনের ফসল চাষে চাষিদের উৎসাহিত করতে প্রণোদনা হিসেবে বীজ ও সার সরবরাহ করে যাচ্ছে। সোনালি আঁশ পাটের আবাদ সফলভাবে সম্পন্ন করতে

মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান।

গোপালগঞ্জে পাটে প্রণোদনা পাচ্ছেন ১২ হাজার কৃষক

গোপালগঞ্জ জেলার ৫ উপজেলায় পাটে প্রণোদনা পাচ্ছেন ১২ হাজার কৃষক। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে ১২ হজার কৃষককে ১২ হাজার কেজি পাট বীজ বিতরণ করা হবে। প্রণোদনার এসব পাট বীজ দিয়ে কৃষক জেলায় পাটের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করবেন। ২৩শে মার্চ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক আবদুল কাদের সরদার সংবাদ মাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

তিনি আরও বলেন, এ কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২ হাজার ৩৫০ জন কৃষককে প্রণোদনার ২ হাজার ৩৫০ কেজি পাট বীজ দেওয়া হবে। মুকসুদপুর উপজেলায় ৪ হাজার ৬৫০ জন কৃষকের মাঝে ৪ হাজার ৬৫০ কেজি পাট বীজ বিতরণ করা হবে। কাশিয়ানী উপজেলায় ৩ হাজার কৃষক পাবেন ৩ হাজার কেজি প্রণোদনার পাট বীজ। টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১ হাজার কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হবে ১ হাজার কেজি পাট বীজ। এছাড়া কোটালীপাড়া উপজেলায় ১ হাজার কৃষক পাবেন প্রণোদনার ১ হাজার কেজি পাট বীজ।

গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের সরদার বলেন, কৃষককে প্রতি ১ কেজি করে পাট বীজ বিতরণ করা হবে। এসব পাট বীজ দিয়ে কৃষক ১২ হাজার বিঘা জমি আবাদ করবেন। এ কারণে জেলায় পাটের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোপালগঞ্জে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে ৮১ হাজার ৬৫৩ হেক্টরে

চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জে ৮১ হাজার ৬৫৩ হেক্টরে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। গত মৌসুমে আবাদ হয়েছিল ৮১ হাজার ২২৯ হেক্টরে। সেই হিসাবে এ বছর জেলায় বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২৪ হেক্টরে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে (চালে) ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৪৯৭ টন। গত বছরের চেয়ে এ বছর ২ হাজার ৫২ টন চাল বেশি উৎপাদিত হবে। ২৫শে মার্চ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির অফিস সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের সরদার বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলায় ধানের উৎপাদন ও আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭০ হাজার কৃষককে বিনামূল্যে প্রণোদনার বীজ-সার প্রদান করা হয়। প্রণোদনার বীজ-সার দিয়ে কৃষক ৭০ হাজার বিঘা জমি আবাদ করেছে। তাই গোপালগঞ্জে বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গত কারণে ধানের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদনঃ জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, বিশ্বব্যাপী দেশগুলোকে ২০৫০ সালের আগে নেট জিরো নির্গমন অর্জন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে জরুরি ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি মানবজাতির সামনে অভূতপূর্ব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৈশ্বিক জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। কেনিয়ার নাইরোবিতে ষষ্ঠ জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে ন্যাশনাল স্টেটমেন্ট প্রদানকালে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইউএনইএ-৬-এর সভাপতি লেইলা বেনালি, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, বিশিষ্ট প্রতিনিধি এবং বিশ্ব নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ১লা মার্চ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে নগন্য অবদান সত্ত্বেও বাংলাদেশ হিমবাহের গলন, বন্যা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো বিরূপ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলো নিরসনের গুরুত্ব এবং টেকসই স্থাপনার লক্ষ্যে আরও বেশি বহুপক্ষীয় প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের পরিবেশগত দায়িত্বের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে পরিবেশ মন্ত্রী ২০১৯ সালে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'পৃথিবীর জরুরি অবস্থা' ঘোষণার প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন। পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী 'প্লাস্টিক দূষণকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করে জাতীয়-আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে প্লাস্টিকের বর্জ্য মোকাবিলা এবং টেকসই ভোগ ও উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিবেশগত শাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইউএনইএ-৬ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও সবুজ, আরও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জলবায়ু সহনশীল উদ্যোগ

২০২৩ সাল থেকে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছা দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সুইডিশ রাজকন্যা। তিনি ১৯শে মার্চ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু

পরিবর্তন অভিযোজনে ইউএনডিপির কর্মসূচি দেখতে খুলনা এবং চট্টগ্রাম সফর করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিতে ক্রাউন প্রিন্সেস স্থানীয় কমিউনিটির জনসাধারণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষ, বিশেষত নারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

স্থানীয়ভিত্তিক জীবিকার সমাধানগুলোকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে ক্রাউন প্রিন্সেস জলবায়ু সহনশীলতার মডেলগুলোর সাফল্যের গূঢ় রহস্য জানার চেষ্টা করেন। দিনব্যাপী ক্রাউন প্রিন্সেস সুইডেন সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে গৃহীত ইউএনডিপির প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি খুলনার কয়রা উপজেলার মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নে সুইডিশ সরকারের সহায়তায় ইউএনডিপি এবং ইউএনসিডিএফ গৃহীত জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও ইউএনডিপির সহায়তায় পরিচালিত এটুআই ডিজিটাল পরিষেবা সরবরাহ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, যেখানে গ্রামীণ জনগণ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ক্রাউন প্রিন্সেস চট্টগ্রামের দক্ষিণ জেলেপাড়ায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত একটি কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নারীদের নেতৃত্বে নির্মিত জলবায়ু সহনশীল বাসস্থানগুলো ঘুরে দেখেন। তিনি ইউএনডিপির সহায়তায় যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তির আওতায় নির্মিত একটি বাঁধ প্রাচীরসহ জলবায়ু মোকাবিলার উদ্দেশ্যে নির্মিত বেশকিছু স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৫শে মার্চ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪' প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন –পিআইডি

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পর্যায়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪' প্রদান করেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫শে মার্চ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় বেসামরিক এই পুরস্কার প্রদান করেন। এবার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে তিনজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একজন, চিকিৎসাবিদ্যায় একজন পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া সংস্কৃতিতে একজন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন ও সমাজসেবায় তিনজন এই পুরস্কার পেয়েছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন: স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছেন কাজী আবদুস সাত্তার বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নঈম মো. নজিব উদ্দীন খান (খুররম) (মরণোত্তর)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পুরস্কার পেয়েছেন ড. মোবারক আহমদ খান, চিকিৎসাবিদ্যায় ডা. হরিশংকর দাশ। সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফিরোজা খাতুন। সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছেন অরণ্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী ও এস এম আব্রাহাম লিংকন। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম স্বর্ণের পদক, সম্মানীর অর্থের চেক ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সঞ্চালনা করেন। তিনি পুরস্কার বিজয়ীদের সাইটেশন পাঠ করেন।

কলকাতার ছবি *মায়া*'য় মিথিলা

গত বছর কলকাতায় মুক্তি পায় রাফিয়াত রশীদ মিথিলা অভিনীত *মায়া*। এই ছবি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমায় অভিষেক হয় বাংলাদেশি এই মডেল-অভিনেত্রীর। এবার কলকাতায় তার দ্বিতীয় ছবি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এছাড়া আগামী মাসেই মিথিলার নতুন সিনেমা মুক্তি পাবে বাংলাদেশে। ২৯শে মার্চ মাল্টিপ্লেক্সসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ও *অভাগী* ছবিটি। অনির্বাণ চক্রবর্তী পরিচালিত ছবিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *অভাগীর স্বর্গ*-এর ছায়া অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। এর আগে কলকাতায় মিথিলার প্রথম সিনেমা *মায়া*ও তৈরি হয়েছিল সাহিত্য অবলম্বনে। সেটি তৈরি হয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ*-এর প্রেরণায়। ও *অভাগী* সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিথিলা।

সিনেমাটিতে মিথিলা ছাড়াও অভিনয় করেছেন সায়ন ঘোষ, সুব্রত দত্ত, দেবযানী চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। এদিকে বাংলাদেশে ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা মিথিলা অভিনীত গিয়াস উদ্দিন সেলিমের

কাজলরেখা। মিথিলা ও মন্দিরা *কাজলরেখা* ছবিতে এভাবেই দেখা যাবে এ দুই অভিনয়শিল্পীকে। এ ছবিতে কঙ্কণ দাসী চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিথিলা। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই দেশের প্রেক্ষাগৃহে দুটি ভিন্ন স্বাদের সিনেমায় পাওয়া যাবে মিথিলাকে।

কাজলরেখায় আরও অভিনয় করেছেন মন্দিরা চক্রবর্তী, শরীফুল রাজ, ইরেশ যাকের, আজাদ আবুল কালাম, খায়রুল বাসার, সাদিয়া আয়মান প্রমুখ। ময়মনসিংহ গীতিকার *কাজলরেখা* অবলম্বনে এটি পরিচালনার পাশাপাশি এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ বিন্যাস করেছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেল ৩০০ পরিবার

নরসিংদীর রায়পুরায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রান্তিক জনগণের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জেলার প্রত্যেকটি উপজেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক। ৩০শে মার্চ রায়পুরা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ৩০০ দুস্থ অসচ্ছল পরিবারের হাতে এসব উপহার তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড. বদিউল আলম। প্রতি প্যাকেট ঈদ উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৫ কেজি চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি চিনি, ২ লিটার সয়াবিন তেল, সেমাই ২ প্যাকেট ও নুডুলস ৩ প্যাকেট। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোজলিন শহীদ চৌধুরী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

৪০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি

৪০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। রাজধানী ঢাকার ১০০টি স্থানসহ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরের খোলাবাজার থেকে টিসিবির কার্ডধারী পরিবারের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তারা এ পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। ২রা এপ্রিল কারওয়ান বাজারে অবস্থিত টিসিবি ভবনের সামনে প্রধান অতিথি হিসেবে এই পেঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। অনুষ্ঠানে টিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, কারওয়ান বাজারের টিসিবি ভবন, সচিবালয় ও প্রেসক্লাবের সামনেসহ ঢাকার ১০৩টি জায়গায় ট্রাকের মাধ্যমে পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। একই কায়দায় চট্টগ্রামের ৫০ ও গাজীপুরের ১৫ থেকে ২০টি জায়গায় পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ট্রাকে ১০ টন করে পেঁয়াজ থাকবে এবং প্রতি কেজি ৪০ টাকা দরে বিক্রি করা হবে। টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীসহ যে কেউ ট্রাক থেকে সর্বোচ্চ আড়াই কেজি পেঁয়াজ কিনতে পারবেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, পেঁয়াজ আনার ক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি ছিল। যখন আমরা পেলাম, তখনও আমরা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম যে আমরা এই পেঁয়াজ এনে রোজা শেষ হওয়ার আগে ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছাতে পারব কি না। আপনারা বিশ্বাসও করবেন না, এই পেঁয়াজ দিল্লি থেকে লোডিং হয়ে দর্শনা হয়ে ট্রাকে আজকে এখানে আসছে। এটা আনার জন্য অস্বাভাবিক লজিস্টিক প্রয়োজন। টিসিবি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি পেঁয়াজও নষ্ট না হয়ে দেশে এসেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হয়েছে। পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে কমে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। তারপরও আমরা এই ঝুঁকি নিয়েছি। এটি সাধারণ মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সিরিজ জয়

মুশফিকুর রহিম জয়সূচক বাউন্ডারি হাঁকাতেই ডাগআউটে নাজমুল হোসেনের উদ্‌যাপন ছিল দেখার মতো। ওয়ানডে সিরিজ জয়

দিয়ে তিন সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে শুরু করা নাজমুলের উচ্ছ্বাস অনুমিত। আর এজন্য কৃতিত্ব অনেকখানি প্রাপ্য দুই তরুণ তুর্কি তানজিদ হাসান ও রিশাদ হোসেনের। ২৩৬ রান তাড়া করতে নামা বাংলাদেশ ১৭৮ রানে ছয় উইকেট হারানোর পর শুরু হয় রিশাদ-ঝড়। আট নম্বরে নেমে মাত্র ১৮ বলে অপরাজিত ৪৮ রানের দুঃসাহসিক ইনিংস খেলে রিশাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়ে।

গত ১৮ই মার্চ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তৃতীয় ও শেষ ওডিআইতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান করে শ্রীলংকা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুশফিকের তৃতীয় বাউন্ডারিতে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয় চার উইকেট ও ৫৮ বল হাতে রেখে। চার উইকেটের জয়ে স্বাগতিকরা ওয়ানডে সিরিজ নিজেদের করে নেয় ২-১ এ।

এমন বিজয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজারসহ দলের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে শুভকামনা জানান। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন, বাংলাদেশ দলের জয়ের এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ইতিহাস গড়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

নেপালের মাঠে আরও একবার শিরোপা উৎসব করল বাংলাদেশের মেয়েরা। সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। ১০ই মার্চ কাঠমান্ডুর আনফা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টাইব্রেকারে শক্তিশালী ভারতকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় অর্পিতা বিশ্বাস-সুরভী আকন্দরা। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ছিল।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নেপালে সাফ সিনিয়র নারী ফুটবলে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। ওই টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল বাংলাদেশ। সেই নেপালে উৎসবে মাতলেন সাবিনাদের উত্তরসূরিরা। এবারও পুরো আসরে অপরাজিত থেকে শিরোপা জিতেছে অর্পিতারা। পার্থক্য এতটুকুই, স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিলেন সাবিনারা। এবার ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিতল অনূর্ধ্ব-১৬ দল।

দ্য হানড্রেডের ড্রাফটে বাংলাদেশের ১৬ জন

ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেডের প্লেয়ার্স ড্রাফটে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের ১৬ ক্রিকেটার। ছেলেদের প্রতিযোগিতার ড্রাফটে বাংলাদেশ থেকে আছেন সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, তামিম ইকবাল, তাওহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, জাকের আলী, তানজিদ হাসান, আফিফ হোসেন, শামীম হোসেন, শহীদুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার ও রনি তালুকদার। আর মেয়েদের প্রতিযোগিতার ড্রাফটে একমাত্র বাংলাদেশি আছেন জাহানারা আলম। ১০০ বলের এই প্রতিযোগিতার ড্রাফটের জন্য নাম নিবন্ধন করা ক্রিকেটারদের তালিকা ৫ই মার্চ প্রকাশ করা হয়। যেখানে আছেন মোট ৮৯০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে ৩৮৯ বিদেশিসহ পুরুষ ক্রিকেটার ৬৩৪ জন।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শীর্ষ দশে নাহিদা

বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছেন নাহিদা আক্তার। অসি মেয়েদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে কিপটে বোলিংয়ে দুই উইকেট নেন নাহিদা। ১০ ওভারে দেন মাত্র ২৭ রান। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে উইকেট না পেলেও আট ওভারে মাত্র ১৯ রান দেন নাহিদা। ২৬শে মার্চ প্রকাশিত আইসিসির সাপ্তাহিক হালনাগাদ র‍্যাংকিংয়ে নাহিদা এগিয়েছেন চার ধাপ, ১৪ নম্বর থেকে উঠে এসেছেন ১০ নম্বরে, যা ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের নারী বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ডিসেম্বরে তিনি ১২ নম্বরে উঠে এসেছিলেন। তখনো নাহিদা ছিলেন বাংলাদেশিদের মধ্যে শীর্ষে।

আইসিসিতে বাংলাদেশের চার নারী

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ডেভেলপমেন্ট প্যানেলে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের চার নারী আম্পায়ার এবং একজন ম্যাচ রেফারি। ২২শে মার্চ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইসিসি। সাথিরা জাকির, রোকেয়া সুলতানা, ডলি রানী ও চম্পা চাকমা আম্পায়ার এবং ম্যাচ রেফারি হয়েছেন সুপ্রিয়া রানী দাস।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী খালিদ

শফিকুল ইসলাম

আশি ও নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী, 'চাইম' ব্যান্ডের ভোকালিস্ট খালিদ মারা গেছেন। ১৮ই মার্চ সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে খালিদকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তার মৃত্যুতে সংগীত অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

১৯৬৫ সালের ১লা আগস্ট গোপালগঞ্জে জন্ম নেন খালিদ আনোয়ার সাইফুল্লাহ। তিনি খালিদ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৮১ সালে তিনি সংগীত জগতে প্রবেশ করেন। 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' নামক একটি ব্যান্ড দলে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে ফ্রিজিং পয়েন্টের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চাইম', যার প্রধান গায়ক হন খালিদ। ১৯৮৫ সালে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সারগাম থেকে 'চাইম' ব্যান্ডের একই নামের প্রথম অ্যালবামে প্রথম কণ্ঠ দেন তিনি। সেখানে তার গান ছিল– 'বেকারত্ব, 'নাতি খাতি বেলা গেল', 'তুমি জানো নারে প্রিয়', 'কীর্তনখোলা নদীতে আমার', 'এক ঘরেতে বসত কইরা', 'ওই চোখ', 'প্রেম', 'সাতখানি মন বেজেছি আমরা' এবং 'আমার জন্য রেখো গান'সহ আরও দুটি ইংরেজি গান। সেই অ্যালবামের 'নাতি খাতি বেলা গেল' গানটি আশির দশকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। খালিদ উঠে আসেন তরুণদের প্রিয় শিল্পীর তালিকায়।

একের পর এক হিট গান উপহার দিয়ে অল্প সময়েই খ্যাতি পান খালিদ। চাইম ব্যান্ডের গানের পাশাপাশি খালিদের কণ্ঠের একক অনেক গান দিয়ে বুকের ক্ষত ঢাকতেন অগণিত মানুষ। যে গান একসময় পাড়া-মহল্লার বিভিন্ন শ্রোতাদের মুখে মুখে থাকত, বাজত বিভিন্ন বিপণিবিতানসহ দোকানে দোকানে, সে গানগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন, সুর করেছেন প্রিন্স মাহমুদ। এই জুটির সৃষ্ট অনবদ্য গানগুলো শ্রোতাদের মোহিত করে রাখত।

ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, মাকসুদ ও শাফিন আহমেদের পাশাপাশি মিশ্র অ্যালবামে খালিদের গান আলাদা একটা ভূমিকা রাখত। শ্রোতারা তার মায়াময় গানের কারণে অ্যালবাম কিনতেন। সেইসব মিশ্র অ্যালবামে খালিদের কণ্ঠের 'সরলতার প্রতিমা', 'যতটা মেঘ হলে বৃষ্টি নামে', 'কোনো কারণেই ফেরানো গেল না তাকে', 'হয়নি যাবার বেলা', 'যদি হিমালয় হয়ে দুঃখ আসে', 'তুমি নেই তাই' ও 'আকাশনীলা' গানগুলো এখনো মানুষের কানে বাজে। তার গান এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। চাইম ব্যান্ডের অ্যালবাম, একক ও যৌথ অ্যালবাম যাতে খালিদ কণ্ঠ দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে– চাইম (১৯৮৫), নারী (১৯৯৬), জন্ম (২০০২), কীর্তনখোলা (২০০৫), সরলতার প্রতিমা (২০০৭), সাত আসমান (২০০৭), হৃদয় ভাঙার শব্দ (২০০৭), স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন (২০০৭), ঘুমাও (২০০৮)।

ব্যক্তিগত জীবনে খালিদ শামীমা জামানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হয়েছিলেন খালিদ। কয়েক মাস আগে স্ত্রীসহ দেশে আসেন তিনি। কয়েক বছর ধরেই হৃদরোগে ভুগছিলেন। একাধিকবার চিকিৎসাও নিয়েছেন তিনি। তার হৃদযন্ত্রে একটি স্টেন্ট বসানো ছিল। ১৮ই মার্চ রাত ১১টায় গ্রিন রোড জামে মসজিদে জানাজা শেষে খালিদের মরদেহ গোপালগঞ্জে নেওয়া হয়। ১৯শে মার্চ জোহরের নামাজের পর গোপালগঞ্জের এস এম মডেল সরকারি হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় তার দ্বিতীয় জানাজা। এরপর গেটপাড়া এলাকার পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 10, April 2024, Tk. 25.00

'বাংলা নববর্ষ ১৪৩১' উপলক্ষে ১৪ই এপ্রিল ২০২৪ ঢাকায় রমনা বটমূলে ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসব –পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd